রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

বর্তমান বছরের রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতার বিষয় স্থির হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা। উত্তর-পূর্বাঞ্চল বলতে বোঝানো হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত (North-east India)। বক্তব্যের শুরুতেই বলা প্রয়োজন 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' নামে আমার একটি গ্রন্থ আছে, যার দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০০২ ও ২০০৬ সালে। প্রথম খণ্ডটির আবার পরিবর্ধিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে ২০১০-এর ডিসেম্বরে। উক্ত গ্রন্থের দুটো খণ্ডেই আমি উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা কবিতা নিয়ে সাধ্যমতো আলোচনা করেছি। সুতরাং আজকের এই বক্তব্যে তেমন নতুন করে বলার কিছু নেই, বরং রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত বক্তৃতার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশিত গ্রন্থের বক্তব্যকেই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। যাঁরা গ্রন্থ দুটি পড়েছেন তাঁদের কাছে আজকের বক্তব্য হয়তো পুনরাবৃত্তিই মনে হবে সন্দেহ নেই।

কেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে এই আলোচনা :

আমাকে যে-অঞ্চল নিয়ে বলতে বলা হয়েছে তাকে আমি তিন দশকেরও কিছু আগে (১৯৮০) 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন' বলে চিহ্নিত করেছিলাম। সে-সময়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম : "বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রাজধানী কলকাতা। সাহিত্যের রথী মহারথীরা প্রায় সকলেই কলকাতার বা তার আশপাশের বাসিন্দা। কলকাতার বাইরেও একটি স্বীকৃত বলিষ্ঠ ধারা রয়েছে বাংলাদেশে। দুই দেশের সাহিত্যের স্বাদও আলাদা। পেশাদার প্রকাশক কিংবা সমালোচকদের দ্বারা এখন পর্যন্ত তেমনভাবে স্বীকৃত না হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্যের যে 'তৃতীয় ভুবন' বর্তমান তাও উপেক্ষণীয় নয়।"[১] প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন কথাটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন — অনেকে আবার বিরোধিতা করে বললেন যে এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ পাচ্ছেন। তখন আমাকে 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন' নাম দিয়ে আলাদা একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় যা ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয় গুয়াহাটির 'প্রাসঙ্গিক' পত্রিকায়, পরে আলাদা পুস্তিকা হিসেবেও প্রকাশ পেয়েছে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়।[২] উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট করে লিখলাম — "সাতচল্লিশের স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগ বাংলা সাহিত্যের ভুবনকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দিল। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার মধ্যে গড়ে ওঠে এক বিশাল রাজনৈতিক দেওয়াল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগৎ ভাগ হয় দুটি প্রধান ভাগে, যাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ভুবন বলে চিহ্নিত করি। এই দুই ভুবনকে মেনে নিতে পাঠক কিংবা সমালোচকদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই দুই ভুবনের বাইরেও নানাবিধ বাস্তব কারণে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে বাংলা সাহিত্যের একটি জগৎ গড়ে উঠেছে তার খবর এখনও অনেকের কাছে পৌঁছোয়নি। দুই স্বীকৃত ভুবনের বাইরে বাংলা সাহিত্যের এই জগৎকেই আমরা বলি বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন।" লিখেছিলাম — "তৃতীয় ভুবন একটি বাস্তব সত্য—আমরা কোনো প্রস্তাব নিয়ে একে তৈরী করিনি, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণেই

তা গড়ে উঠেছে— আমরা কেবল তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছি— এই পর্যন্ত।" তৃতীয় ভুবন শব্দবন্ধ ব্যবহার না-করলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এলাকা সে-কথার স্বীকৃতি আজকের এই বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন। রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন সত্যটা মেনে নিয়ে এমন বক্তৃতার আয়োজন করেছেন, এ খুব আনন্দের কথা।

এই তৃতীয় ভুবন কথাটা চালু হয়ে যাওয়ার অনেক পরে ঢাকার 'আবহমান' নামক একটি বিখ্যাত পত্রিকায় কলকাতার বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এর অন্যতম লেখক কলিম খান তাঁর 'আনিলাম অপরিচিতের নাম'[৩] প্রবন্ধে বাংলা ভাষার এই বিভিন্ন ভুবন তত্ত্বকে আরও প্রসারিত করে লিখলেন: "আজ আমাদের বাংলা ভাষা পঞ্চভুবনে পরিব্যাপ্ত— (এক) পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির জগৎ, (দুই) বাংলাদেশের বাঙালির জগৎ, (তিন) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালির জগৎ, (চার) ভারতের বাকি অংশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালির জগৎ ও (পাঁচ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রবাসী বাঙালির জগৎ। সব মিলিয়ে ২৪ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পঞ্চভুবন। লক্ষণীয় যে তৃতীয় ভুবন (হাইলাকান্দির বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলা ভাষার তৃতীয় ভুবন নামে শনাক্ত করেন। মনে রাখা দরকার, তাঁদের মোট চৌদ্দজন তরুণ তরুণী— ১৯৬১ সালের ১৯শে মে, ১৯৭২ সালের ১৭ই আগস্ট, ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই তারিখে বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন।) উত্তর-পূর্ব ভারত এখন ত্রিপুরা সহ সাতটি রাজ্যে বিভক্ত ... বাংলা ভাষার যা কিছু উত্তরাধিকার ও দক্ষিণাধিকার তা-সবের স্বাভাবিক অধিকারী এই পঞ্চভুবন। ... উত্তরাধিকার বলতে বাংলাভাষার এ যাবৎ অর্জিত সম্পদের ধারণ ও বহন করে নিয়ে চলার অধিকার ও দক্ষিণাধিকার বলতে বাংলা ভাষার ভবিষ্যতের অর্জনের অধিকার, সৃজনের অধিকারের কথা বলা হচ্ছে।"

এই পঞ্চভুবনে ব্যাপ্ত যে-বাংলা কবিতা, তারই যোগফলে অখণ্ড বাঙালির, বাংলা কবিতার পরিচয়। তবে সমস্তকে একসঙ্গে দেখতে গেলে তার প্রতিটি ভুবনের পরিচয় তন্ন তন্ন করে জানতে হয়, কাউকে কম কাউকে বেশি গুরুত্ব দিলে চলবে না। হতে পারে, যে যাকে জানে সে তাকে উপস্থিত করুক, আর এইভাবে লোকসমাজে, পাঠকসমাজে উপস্থিত হোক পঞ্চভুবন। এক বছর আগে এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতায় আমরা প্রথম ভুবনের বাংলা কবিতার পরিচয় পেয়েছি, আমার আজকের বক্তৃতার বিষয় কেবল তৃতীয় ভুবনের, অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা। এ এক পরিপূরক বক্তব্যের প্রয়াস মাত্র— তার বেশি কিছু দাবি করি না।

২

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন এই যে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' কিংবা বাংলাদেশের বাংলা কবিতা, চতুর্থ ভুবনের বা বহির্বঙ্গের বাংলা কবিতা এ-সব কথা কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের। স্বাধীনতার আগে অতুলপ্রসাদ সেন, বনফুল, জসীমউদ্দিন কিংবা বৃহত্তর ত্রিপুরার দীনেশচন্দ্র সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুরমা উপত্যকার দেবীযুদ্ধের শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, অশোকবিজয় রাহা, রসময় দাশ সকলেই বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দেরই মতো ছিলেন কেবল বাংলা সাহিত্যের লেখক কিংবা কবি। প্রবাসী বাঙালি ছিল— কিন্তু প্রবাসী বাঙালির সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গের সাহিত্য, বহির্বঙ্গের সাহিত্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য কথাগুলো একে একে এল। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা কথাটা একান্তই দেশবিভাগ-পরবর্তী— আমিও তাই আমার আলোচনা সীমিত রাখতে চাই দেশবিভাগ-পরবর্তী কালের কথায়। আবার শেষ সীমাও টানছি গত শতাব্দীর শেষ, অর্থাৎ ২০০০ সাল পর্যন্ত। বর্তমান শতকে এই অঞ্চলের বাংলা কবিতার যে-বিস্তার ঘটেছে, যে-নতুন অর্জন এসেছে তার আলোচনার জন্য বোধহয় আরও কিছুটা কাল অপেক্ষা করা উচিত। যাঁরা নতুন এলেন, তাঁরা কে কতদিন লিখবেন, কে-বা সরে পড়বেন তা জানার জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন।

৩

আমরা জানি বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে একটা বিশেষ সাহিত্যই গড়ে উঠতে পারে। ভাষাচর্চাই হোক কিংবা সাহিত্যচর্চাই হোক তা স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। আবার এও সত্য যে একটি ভাষায় একটিই সাহিত্য হয়, তাই বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য তার বিশেষ বিশেষ স্থানের ও কালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই বাংলা সাহিত্য। অখণ্ড বাংলা সাহিত্যই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধারাকে গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যের পঞ্চভুবনে। এক অখণ্ড

বাংলা-সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা যখন আজকের দুয়ারে উপস্থিত, তখনও জানি সাহিত্যের বিচারে স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। একই ভাষার সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণের বাইরেও বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে কিছু বিশেষ লক্ষণ ধরা পড়ে, যা তার আঞ্চলিক অর্জন। আবার পাত্র বিশেষেও অর্জনের কিংবা বিচারের তারতম্য ঘটে।

আমাদের এই ভুবনের বাঙালির কাব্য-সাহিত্য চর্চার পেছনে রয়েছে তাদের অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, সাহিত্যচর্চা এখানে কারও কাছে জীবিকার পথ নয় এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সময়েই লোকসানের ব্যাপার। শুধুই মানসিক প্রাপ্তির কথা ভেবে, কেবলই অন্তরের তাগিদে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে দিনের পর দিন সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাওয়ার কথা সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের পেশাদার সাহিত্যিকরা বর্তমানকালে ভাবতেই পারবেন না। এই সীমাহীন নিষ্ঠা ও ভালোবাসার পেছনে অর্থকরী কোনো দিক যেমন নেই, তেমনই বাংলা সাহিত্যের দরবারে খ্যাতির আসন লাভের আশু আশাও তেমন নেই, আছে কেবল ভাষার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা আর এক জরুরি সংগ্রাম— বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরিকল্পিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যোগ দিয়ে যেমন এ-অঞ্চলের বাঙালিকে বারবার শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, তেমনই করতে হচ্ছে শত শত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ভাষার সুরক্ষা এবং নবতর অর্জনের প্রয়াস।

হ্যাঁ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য মূলত লিট্‌ল ম্যাগাজিন নির্ভর, যেমন চতুর্থ ভুবনের সাহিত্যচর্চাও। পশ্চিমবাংলায় এবং বাংলাদেশেও সাহিত্যচর্চায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবল নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত পত্রপত্রিকা এবং বড় বড় প্রকাশন সংস্থার পাশাপাশি চলছে লিট্‌ল ম্যাগাজিন— আর চলতে চলতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একটা অংশ নিয়মিত মিশে যাচ্ছে বাণিজ্যিক স্রোতে। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাশে লিট্‌ল ম্যাগাজিন। হালে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে কিছুটা হাত বাড়াতে চাইলেও তারা কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মূল স্রোতকে প্রভাবিত করার মতো শক্তি এখনও সঞ্চয় করতে পারেনি। আমাদের আলোচনাও তাই এগিয়ে চলবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আন্দোলনের এগিয়ে চলার পথ ধরে।

তৃতীয় ভুবনের, অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য চর্চায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক তার কবিতা। দেশ বিভাগের আগে, যখন এ-অঞ্চল প্রধান বঙ্গভাষী অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক দেওয়ালে বিচ্ছিন্ন ছিল না, তখনও সৃষ্টিশীল রচনার বিচারে এ-অঞ্চলের কাব্যচর্চাই ছিল সম্ভবত অধিক উন্নত। যদিও এ-অঞ্চলের গদ্যচর্চার ইতিহাসও উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গদ্যের চর্চাও কবিতা-চর্চারই মতো বহু প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। তবে কবিতার কথায় দেখি ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৪৩১-১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দ) আদেশে 'রাজমালা' নামক আখ্যানকাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত কিংবা রচিত হয়েছিল। এই আখ্যানকাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্যেরই নিদর্শন। বাংলা কাব্যচর্চায় কাছাড়ের রাজ-পরিবারেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট কবিকে পাচ্ছি— তাঁরা হলেন ভুবনেশ্বর বাচস্পতি, কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন, মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্র ধ্বজ নারায়ণ, চন্দ্রমোহন বর্মন, রামকুমার নন্দী। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য, বীরচন্দ্র-দুহিতা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী— কবি হিসেবে এঁরা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র, অনঙ্গচন্দ্রও কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক এই দুই রাজ-পরিবারের মাতৃভাষা বাংলা ছিল না, যদিও বাংলাকেই তাঁরা রাজকার্যের কিংবা সাহিত্যচর্চারও বাহন করে নিয়েছিলেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে উক্ত রাজ্যদ্বয়ের রাজারা নিজেদের রাজ্যকে বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্য বলে মানতেন।[৪] প্রজাদেরও অধিকাংশ ছিলেন বঙ্গভাষী।

কিন্তু এ-সব তো স্বাধীনতার আগেকার কথা। স্বাধীনতার পরে এল উলটোরথের পালা। ভারতে স্বাধীনতার জন্য যে-বাঙালি জাতি সবচেয়ে বেশি প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, স্বাধীনতা আর দেশভাগ সেই বাঙালির জীবনকে একেবারে তছনছ করে দিল। ভারতে আর-কোনো ভাষার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য এত মূল্য দিতে হয়নি। একটু আগেই বলেছিলাম এ-অঞ্চলে বাংলা ভাষা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল রাজ-আমলে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে একমাত্র ত্রিপুরা বাদ দিলে বাংলা ভাষার উপর নেমে এল নতুন রাজার আক্রমণ, প্রতিরোধ-আন্দোলনে শহিদ হতে হল আসাম রাজ্যে বাঙালিকে বার বার

তিনবার। এই পরিবর্তিত পরিবেশে, রাজ-আনুকূল্যের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গের উদাসীনতায় বারবার ভ্রাতৃঘাতী আক্রমণের মোকাবিলা করে বাঙালি যে নতুন ভুবন আবিষ্কার করল তার প্রভাব পড়ল সাহিত্যচর্চার, কবিতাচর্চার জগতেও।

স্বাধীনতার পরবর্তী এক-দেড় দশকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠুক, আসামের বাঙালি কবিরা কিন্তু ভাবলেন একটু অন্যভাবে। তাঁদের আন্দোলন হল বাংলা ভাষার মূল স্রোতে এ-অঞ্চলের বাংলা কবিতাকে ধরে রাখার প্রয়াস। উন্নত সাহিত্যচর্চাই রক্ষা করবে ভাষাকে— কাজেই কোনো উত্তেজনার ফাঁদে পা না-দিয়ে এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যকে, বাংলা কাব্যচর্চাকে এতটা উন্নত করতে হবে যে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে এটাই হবে এক প্রধান হাতিয়ার।

স্বাধীনতার পরবর্তী দু-দশকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এত সাহিত্য-পত্রিকা বেরিয়েছে যার প্রকৃত হিসেব রাখা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর এইসব পত্রপত্রিকার অধিকাংশই যে কবিতা-প্রধান ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অসংখ্য পত্রপত্রিকার বিরাট অংশই ছিল চরিত্রে ওষধি, আর অনেক কবিও বছর দু-বছর লিখে যে-যার স্টেশনে নেমে পড়েছেন। যাঁরা ছিলেন সামনে তাঁরা অনেকেই রয়ে গেছেন পেছনে, কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে এগিয়ে দিয়েছে কবিতাকে। সৎ সাহিত্য-পত্রিকার অভাব এবং কলকাতার পত্রপত্রিকার নিদারুণ উপেক্ষা অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে; প্রচণ্ড অভিমানে অনেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, কেউ-বা পাড়ি দিয়েছেন কলকাতায় আর কিছু কিছু অত্যুৎসাহী কবি ও গল্পকার সমস্ত বাধাকে অবহেলা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্যকে, বিশেষ করে বাংলা কবিতাকে আজকের স্তরে নিয়ে এসেছেন। আজকের বাংলা কাব্যের যে-কোনো সংকলন খুললেই দেখা যাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই এখানকার সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণেরা এখন আর কলকাতায় গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পালাই-পালাই করেন না— যা দেখা গিয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম দশকে। আর এই আশ্চর্য ঘটনা প্রধানত ঘটেছে প্রথমত কাছাড়ের ও ত্রিপুরার কিছু সাহসী কবিগোষ্ঠীর কবিদের হাত ধরে মূলত ষাটের দশকে। যদিও আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকেই।

বৃহত্তর আসামে কাছাড়ের বাইরে প্রধানত শিলং, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড়ে পঞ্চাশের দশক থেকে প্রকাশিত হয়েছে অনেক সাহিত্যপত্র। নিছক কবিতার জন্য না-হলেও সেগুলোকে আশ্রয় করেই কাব্যচর্চা করছিলেন এই অঞ্চলের কবিরা, কিন্তু সে-সব অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত শহিদের ভূমিকা নিয়েছে। তৎকালীন গৌহাটির 'সপ্তপর্ণ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র দীর্ঘজীবী হলেও আসামে বাংলা কাব্যচর্চায় তার ভূমিকা গৌণ। ডিব্রুগড় থেকে বেরিয়েছিল 'সংবর্ত', সম্পাদক ক্ষিতীশ রায় আর উর্ধ্বেন্দু দাশ। অতি উঁচুমানের এমন একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন এ-অঞ্চলে খুব কম ছিল— আর সেই পত্রিকা উর্ধ্বেন্দু দাশের মতো একজন শক্তিশালী কবিকে উপহার দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। ক্ষিতীশ রায়ও একসময় কবি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত শিলঙে একটির পর একটি তরঙ্গ এসেছে। 'সংঘাত' (কবিতা-প্রধান) সম্পাদক ছিলেন বিমল সেনগুপ্ত; নৃপতিধর চৌধুরী এবং পরাগ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রথম পরিচয়'; অমৃতলাল বিশ্বাস, সুভাষ দাশগুপ্ত প্রমুখ চার সম্পাদকের 'সীমান্তের কথা'। ১৯৬১-র রবীন্দ্র-জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিমাসিক 'মুরজ'— বেণুমাধব গোস্বামী, কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য আর আমার সম্পাদনায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শক্তিমান কবি বিশ্বপতি গুপ্ত। বিশেষ করে বিশ্বপতি অনেক স্মরণীয় কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য শেষ কিছুদিন মুরজ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮-র আগে বেরিয়েছিল 'উৎস' (সাইক্লোস্টাইল করা) যার অন্যতম কবি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি। আসলে সে-সময়ে শিলং ছিল আসামে বাংলা সাহিত্য চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র।

এবার বলি কাছাড় অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকার কথা। ষষ্ঠ দশকের শেষার্ধ থেকে কাছাড় জেলায় পত্রপত্রিকার জোয়ার এসেছিল। অসংখ্য নতুন কবি, নতুন কবিতা। করিমগঞ্জ থেকে 'কিশোর', 'উজ্জীবন', 'আলো', 'নবভারতী', 'কাকলি', 'ফলক', 'পদক্ষেপ', 'স্বাক্ষর', 'পথনির্দেশ'; শিলচর থেকে 'অগ্রদূত', 'নতুনপত্র', 'সঞ্চার', 'দিগন্ত', 'মালঞ্চ', 'নবপল্লব', 'রূপান্তর', 'আভাষ', 'আলোক', 'ইশারা', 'সম্ভার', 'লুব্ধক', 'বরাক' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা যেন প্রচণ্ড জীবনীশক্তি নিয়ে পরবর্তী গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল। সেকালে কলেজ-ম্যাগাজিন এবং স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহের সাহিত্য-সাময়িকীর ভূমিকাও

উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে শুধু কবিতার জন্য হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত হল 'স্বপ্নিল' (১৯৫৭), করুণাসিন্ধু দে আর ত্রিদিব মালাকারের সম্পাদনায়। স্বপ্নিল সারা আসামে কেবল কবিতার জন্য প্রথম পত্রিকা মাত্রই নয়, প্রথম যথার্থ আধুনিক কবিতার পত্রিকা।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যখন আসামে (আসাম বলতে এ-প্রবন্ধে বৃহত্তর আসামের কথাই বলা হচ্ছে— স্বাধীনতার পরে যেমন পেয়েছিলাম, আজকের খণ্ড-বিখণ্ড আসাম নয়) পত্রপত্রিকার জোয়ার এসেছিল ; তখন একটু অন্যভাবে ত্রিপুরায় চলছিল বাংলা সাহিত্য চর্চা। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আসাম থেকে প্রকাশিত ছোট পত্রিকার তালিকা করতে গিয়ে একশোরও বেশি পত্রিকার নাম পেয়েছিলাম।

ষাটের দশকের কাছাড় কাব্য-আন্দোলনের আগেও আসামে আমরা বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিকে পেয়েছিলাম, যাঁদের কেউ কেউ দেশ বিভাগের বেশ আগেই কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কেউ শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের দশকেই। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, অশোকবিজয় রাহা, রসময় দাস, পরমানন্দ সরস্বতী, দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সুধীর সেন, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস, অতুলরঞ্জন দেব, মনোজিৎ দাস, সরোজ বিশ্বাস, মণীন্দ্র রায় (অনুজ), আশুতোষ গিরি, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, দেবরঞ্জন ধর প্রমুখ। 'স্বপ্নিল'-এর কথা তো বলেছি— সেখানে আবির্ভাব ঘটেছিল ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহেরও। এঁদের অনেকেই কলকাতা পাড়ি দিলেন, প্রতিষ্ঠিত হলেন বাংলা কাব্যের প্রধান জগতে। এ-অঞ্চলে যাঁরা রইলেন তাঁদের আশ্রয় করে কিন্তু কোনো কাব্য-আন্দোলন কিংবা ভালো ছোট পত্রিকাও জন্ম নিল না। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কাছে শুনেছি সে-সময়ে (পঞ্চাশের দশকে) কাছাড়ের কবিদের আলোচনায় শোনা যেত 'বিষ্ণু দে যেন কেমন কেমন।' অর্থাৎ ভালো করে রবীন্দ্রপ্রভাব কাটেনি তখনও। তেমন পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হল ষাটের দশক অব্দি।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি স্বপন সেনগুপ্ত ত্রিপুরার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন— "রাজ আমলে ত্রিপুরা ছিল স্থির দিঘির মতো শান্ত, জীবনযাত্রা ছিল স্নিগ্ধ। আগরতলায় ছিল রাস, হোলি, ঝুলনের উৎসব-মুখরতা। চারদিকে বৈষ্ণব গন্ধমাখা নাম ধাম। যেমন রাধানগর, কৃষ্ণনগর, বনমালীপুর। রাজ অন্তঃপুরে রাজপুরুষেরা, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, কুমুদিনী, মৃণালিনী, কমলপ্রভারা যখন রবীন্দ্রানুকরণে ব্যস্ত এবং কিছুটা সময়ের ব্যবধানে অজিতবন্ধু দেববর্মা, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নুরুল হুদারা যখন সাহিত্যচর্চা করছেন তখনও মোরামের রাস্তা ছিল, গ্যাসের বাতি জ্বলত, ঘোড়ার গাড়ি ছিল যানবাহন। বুনো হাতি নামত শহরে— টিন বাজাত আর মশাল জ্বেলে রাখত এই গণ্ডগ্রাম আগরতলায়।

"স্বাধীনতা সংগ্রাম, মন্বন্তর, দাঙ্গা, বিলিতি পণ্য পোড়ানো, এ সব কোনো কিছু এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো প্রভাবও পড়েনি রাজ আমলের এই ত্রিপুরায়।"

এই ত্রিপুরা ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে ভারতে যোগ দিল। ওদিকে দেশভাগের পরে-পরেই, রাজার জমিদারি সমতল ত্রিপুরা জেলার ছিন্নমূল মানুষেরা রাজার আশ্রয়ে এসে গেছেন বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরায়— এবং এদের নিয়েই ত্রিপুরা যোগ দিল ভারতে। এই ত্রিপুরার 'পূর্বাশা' পত্রিকা, কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্যেরা বাংলা কাব্যজগতে পরিচিত নাম। সমতল ও পার্বত্য ত্রিপুরার মিলনে সেই শান্ত ত্রিপুরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল। ত্রিপুরার বাংলা কাব্যচর্চায় এল নতুন মুখ। সেই সময়ে বর্তমান ত্রিপুরার লেখকরা সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই সাহিত্যসাধনা করতেন। পূর্ণাঙ্গ কোনো সাহিত্য-পত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন তখনও প্রকাশিত হয়নি। ত্রিপুরার যা সাহিত্য-ঐতিহ্য তা ছিল সেই অংশে যা চলে গেছে পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক বাঙালি চলে এলেন পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে— তারপর রাজ্যটা এল ভারতে— শুরু হল সবকিছু নতুন করে। ১৯৫২-র ১১ ফেব্রুআরি ত্রিপুরার প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা 'সমীক্ষা' প্রকাশিত হল। 'সমীক্ষা' অবশ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছিল না, ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা, আর সেটাই উপহার দিয়েছিল বিমল চৌধুরীর মতো এক অসাধারণ আধুনিক গল্পকারকে। তবু আমরা দেখি, যখন কাছাড়ে, শিলঙে ছোট পত্রিকার বান ডেকেছে সেই পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরায় মাত্র তিনটে পত্রিকার সন্ধান মেলে। 'সমীক্ষা' (১৯৫২), 'গোমতী' (১৯৫৮) আর 'গ্রন্থলোক' (১৯৫৯)।

আমার আলোচ্য সময়কালে, গত শতাব্দীর শেষ পাঁচটি দশকে (১৯৫১-২০০০) বাংলা কবিতায় অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে

ত্রিপুরার একটা ফারাক চোখে পড়ে। সর্বত্রই আমরা দেখি, নতুন কবিরা তাঁদের নতুন নতুন লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে আসরে উপস্থিত হয়েছেন এবং কিছুদিন এইভাবে ছোট পত্রিকায় লেখার পর, প্রকাশিত কবিতা থেকে বাছাই করে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা গোষ্ঠীগত ভাবে কবিতা-সংকলন প্রকাশ করছেন (একমাত্র ব্যতিক্রম শিলচর থেকে প্রকাশিত মণীন্দ্র রায় ও শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত কাব্য-সংকলন 'অরণ্যপুষ্প')। ত্রিপুরার ধারাটা কিছুটা উলটো। নবীন-প্রবীণ কবিরা তো কবিতা চর্চা করছিলেনই, কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য ছোট পত্রিকা প্রকাশের আগেই দেখি একসঙ্গে অনেক কবির কবিতা নিয়ে কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হল। ১৯৬১ ('৬২?) সালে এল প্রথম কাব্য-সংকলন 'প্রান্তিক', খগেশ দেববর্মন এবং সলিলকৃষ্ণ দেববর্মনের সম্পাদনায়। ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হল কাব্য-সংকলন 'এক আকাশ তারা'— সম্পাদক প্রবীর দাস এবং শ্রীবাস ভট্টাচার্য। দুটি সংকলনে আমরা পেলাম কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিকে, তাঁরা রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী আর সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন। আরেক তরুণ কবিকে আমরা পেয়েছিলাম যিনি পরবর্তীকালে বহু-আলোচিত হাংরি জেনারেশনের অন্যতম সদস্য প্রদীপ চৌধুরী।

আগেই বলেছি, গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে, যাকে ইংরেজির অনুকরণে ষাটের দশক বলতে আমরা অভ্যস্ত, বাংলা কবিতার ভুবন কলকাতা-কেন্দ্রিকতার বেড়া ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আসাম ত্রিপুরা উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ বিহার এবং আরও পশ্চিমে। তাই আমরা দেখি, খুব দ্রুত পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে ত্রিপুরার বাংলা কবিতাও বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় মিশে যায়। আমি বলব, যেমন বৃহত্তর আসাম, তেমনই বৃহত্তর ত্রিপুরায়ও অর্থাৎ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা কাব্যচর্চায় গত শতাব্দীর ষাটের দশক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দশক। একসঙ্গে এত বেশি ভালো লিট্‌ল ম্যাগাজিন, এত বেশি উল্লেখযোগ্য কবি, ব্যতিক্রমী ও সাহসী কবি আমরা আর কখনো পাইনি। এই কবিরা বাংলা কবিতায় তাঁদের সমসাময়িকদেরই সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। এবং আজও তাঁরা অনেকেই বাংলা কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

৪

'সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯৬৭) শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখেছেন, "কাব্য আন্দোলনের একটা সহজ সংজ্ঞা যদি এই দেয়া যায় যে, কয়েকজন কবি একই সময়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে কবিতা লিখছেন, পাঠকের মনে তাঁদের কবিভাব সঞ্চারিত করবার জন্য মুখপত্র প্রকাশ করছেন, কিংবা কবিতার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ঋতুবদলের চেষ্টা করছেন এবং সর্বোপরি কাব্য বিষয়ে 'এটা-সেটা' নিয়ে প্রচুর হৈ-হুল্লোড় করছেন; তাহলে বলতেই হয় ১৯৬০-এর পূর্ব পর্যন্ত কাছাড়ে কোনো কাব্য আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না।... বহু আগেই এ অঞ্চলে একাধিক প্রকৃত অর্থে ভালো কবি ছিলেন। কিন্তু তখনকার কবিদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধতা ছিল না, যাঁরা লিখতেন, আপন মনেই লিখতেন।" অথচ এই গোষ্ঠীবদ্ধতা ছাড়া, সে-কালে, কলকাতার বাইরে কোনো কবির বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। শুধু গোষ্ঠীবদ্ধতায় সম্ভব কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা। আর নিয়মিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন না-থাকলে দুরন্ত অভিমানে কবি-গল্পকাররা যে প্রত্যহ কবিতাহীন জগতে, সাহিত্যহীন জগতে নির্বাসিত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

তখন আমরা যাঁরা লিখতে এলাম, এ-সব কথা মাথায় ঘুরত। আরেকটা কথা, আসাম সরকার অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্যভাষা হিসেবে সারা আসামে চাপিয়ে দেবার আইন করায় আমরা বুঝলাম, আসামে বাংলা ভাষায় উন্নত চর্চার জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে। শিলং থেকে ১৯৬১-র ৮ মে (পঁচিশে বৈশাখ) আমরা দশ-বারোজন সহপাঠী বন্ধুবান্ধব মিলিত হয়ে প্রকাশ করলাম দ্বিমাসিক 'মুরজ' (প্রথম সংখ্যার নাম ছিল 'মৌসুমী রাগ')— যার প্রচ্ছদে লেখা থাকত 'মোদের গরব মোদের আশা আ' মরি বাংলা ভাষা'। ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করতে নতুন রকম লিখতে হয় সেও আমাদের মাথায় ছিল। ওদিকে ডিব্রুগড়ে মিলিত হয়েছিলেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়রা— অসাধারণ এবং নতুন ধরনের কাগজ 'সংবর্ত' নিয়ে। কাছাড় থেকে অগ্রজ কবি সুধীর সেন কবিতা লিখলেন 'মুরজ'-এ, লিখলেন বিশ্বজিৎ চৌধুরী, রুচিরা শ্যামেরা। মনে আছে, বিশ্বজিতের একটি কবিতা 'হিরণ্ময় রৌদ্রে যাসনে' পড়ে শিলঙের অনেক অগ্রজ সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন— এ আবার কী রকম কবিতা! দুর্বোধ্যতার অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন অনেকে। মুরজে আরও যে-সব কবি যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা বিশ্বপতি গুপ্ত, স্বপন চক্রবর্তী, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ। বছর দুয়েক শিলঙের বাঙালি পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল মুরজ—

তারপর নানা অনিবার্য কারণে আমরা বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম বিভিন্ন অঞ্চলে— মুরজ থাকল না, একা বেণুমাধব গোস্বামী শিলং থেকে পরবর্তীকালে 'রুদ্রবীণা' সম্পাদনা করে শিলঙে কবিতাচর্চাকে জাগিয়ে রাখলেন কিছুকাল।

মুরজ, সংবর্ত-এর বছর দুয়েক পরে কাছাড়ে যে-কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত হল তার ফল হল সুদূরপ্রসারী। আগে বলেছি, শুধু কবিতার জন্য 'স্বপ্নিল' প্রকাশিত হল হাইলাকান্দি থেকে। কিন্তু স্বপ্নিল-এর কবিরা কলকাতায় গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তাঁদের গোষ্ঠীও গেল ভেঙে।

মুরজ-এর ঠিক দু-বছর বাদে ১৯৬৩ সালের মে মাসে একদল দুঃসাহসী তরুণ— যথার্থ অর্থে আধুনিক কবিদের মুখপত্র 'অতন্দ্র' প্রকাশ করলেন শিলচর থেকে। "শুধু কবিতার জন্য এই পত্রিকার জন্ম— মন্ত্রের মতো এই প্রত্যয় বুকে নিয়ে অতন্দ্রের আবির্ভাব।" অগ্রজ কবি সুধীর সেন ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য এই বলে অতন্দ্র-এর পরিচয় দিয়েছিলেন ('কবির শহর শিলচর', 'কবি ও কবিতা' তৃতীয় সংকলন, কলকাতা)। প্রথম বছর দেড়েক অতন্দ্র ছিল পাক্ষিক, পরে অনিয়মিত। অতন্দ্র-এর সম্পাদক ছিলেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী আর উদয়ন ঘোষ। প্রকাশক শান্তনু ঘোষ। অতন্দ্র-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদল কবি 'অতন্দ্র' গোষ্ঠী বলে পরিচিত হয়েছিলেন— যাঁদের আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল কাছাড় কাব্য আন্দোলন, আর বছর পাঁচেক পরে অতন্দ্র-এর কবিরাই মিলে গেলেন 'সাহিত্য'-এ। প্রকৃত বিচারে অতন্দ্র কবিগোষ্ঠীই কবিতা-বিষয়ক নিভৃত চিন্তায়, মেজাজে, শব্দ-ব্যবহারে, প্রতীক কিংবা চিত্রকল্প নির্মাণে, জীবনবোধের গভীরতায় প্রথম আধুনিক। অশ্লীলতা, দুর্বোধ্যতা এবং বিদেশী আমদানির জন্য যেমন কিছু কিছু অগ্রজ কবির তরফ থেকে, তেমনই পাঠকদের তরফ থেকেও নিন্দার ঝড় উঠেছিল। এর আগে বলেছি, মুরজ-এর কিছু কিছু লেখা নিয়েও আমরা বিরূপ সমালোচনা শুনেছিলাম, কিন্তু অতন্দ্র-এর আগে আঞ্চলিক কবিতা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামাতেন না, কিছুটা করুণা মেশানো অবহেলাও হয়তো থাকত। অতন্দ্র-এর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া অতি দ্রুত বদলে গেল। চড়া গলায় নিন্দা ও প্রশংসা শোনা গেল। আমার মনে হয় অতন্দ্র-এর আধুনিকতার এ এক নিশ্চিত প্রমাণ।

১৯৬৩ থেকে '৬৮, এই পাঁচ বছরে অন্তত একশো জন কবিকে অতন্দ্র-তে দেখা গেছে। তবু অতন্দ্র গোষ্ঠী বলে একদল বিশেষ তরুণকে চিহ্নিত করা হয়, নিন্দা কিংবা প্রশংসার লক্ষ্যস্থল এঁরাই এবং এঁরাই আসামের বাংলা কবিতার প্রথম সারির কয়েকজন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোনো স্থির মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা ধীরে ধীরে অতন্দ্র থেকে সরে গেলেন। বর্তমান নাগাল্যান্ডবাসী 'পূর্বাদ্রি' সম্পাদক কবি দেবাশিস দত্তের নাম এভাবেই উল্লেখ করেছেন অতন্দ্র সম্পাদক বিমল চৌধুরী।[৫] সরে গিয়েছিলেন অতীন দাশ, দীনেশলাল রায়, গণেশ দে প্রমুখ। নতুন পত্রিকা করেছিলেন 'শতাব্দী' নামে। অতন্দ্র, শতাব্দী আর সাহিত্য পাশাপাশি চলেছে কিছুদিন। কাছাড় কাব্য-আন্দোলনে শতাব্দীর নামও উল্লেখ করতে হয়।

যা হোক, কবিতা লেখার ভঙ্গি বা চরিত্রে অতন্দ্র-এর কবিরাও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী পৃথক— তবু একটা সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। অতন্দ্র কবিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ অর্থে শুধুমাত্র কবি। এঁদের আছে ক্লান্তিহীন সাধনা, ভালোবাসাহীন যান্ত্রিক পরিবেশে কখনো বিরক্তি, বিদ্রূপ, বিদ্রোহ, কখনো নিদারুণ হতাশা, গভীর বিষাদবোধ। আত্মানুসন্ধানের যন্ত্রণা আর আত্মকেন্দ্রিকতা, গতির জন্য আকুলতা আর সমর্পণের শান্ত ভঙ্গি। এঁদের কেউ কেউ কবিতায় অবচেতনের ভূমিকা অস্বীকার করেন আবার কয়েকজন বিশ্বাস করেন চেতনা আর অবচেতনার বোধ উপযুক্ত প্রতীক, চিত্রকল্প এবং ধ্বনির মাধ্যমে যথার্থ কবিতার জন্ম দেয়। আপাত-অসংলগ্ন চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের কেন্দ্র থেকে যে-জীবন বেরিয়ে আসে তা-ই সম্পূর্ণ। কারও কারও কবিতায় যৌন অনুভূতির গভীরতা চমৎকারভাবে উপস্থিত। লোকগীতি কিংবা পল্লিকবিতা থেকেও সংগৃহীত সার্থক চিত্রকল্প নিবিড় ঐতিহ্য-চেতনারও বাহক মনে হয়। তবু এই কবিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আনীত প্রধান অভিযোগ অশ্লীলতা, দুর্বোধ্যতা আর শিকড়হীনতা। আর ঠিক এইসব কারণেই ষাটের দশকের অতন্দ্র-সাহিত্যের কবিরা কবিতার রহস্যময়তা, বলিষ্ঠতা এবং মাটির গন্ধের অনুভূতি নিয়ে বাংলা কবিতার বৃহত্তর আসরে প্রবেশ করেছিলেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে— যা পারলেন না সেইসব কবি যাঁরা অতন্দ্র-বিরোধী হয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন, অতন্দ্র-এর কবিরা দেশী ও বিদেশী প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-আন্দোলন থেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন এবং আঞ্চলিক বোধের সঙ্গে তা যুক্ত করে সমৃদ্ধ করেছিলেন বাংলা কবিতাকে।

"আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমন এক যুগে এসে দাঁড়িয়েছি যখন মানবিক সম্পর্কের এক নিদারুণ ভগ্নদশার যুগ— যে যুগ ফাটা দর্পণে নিজের কুৎসিত অবয়বের ততোধিক কুৎসিত প্রতিবিম্ব দেখে ভীত, সন্ত্রস্ত, সংক্ষুব্ধ, উন্মত্ত এবং কখনও বা অসহায়।" বাঙালি জাতি, বিশেষ করে ধর্মীয় এবং ভাষিক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারদিকের কুৎসিত দৃশ্য দেখে এমনই বোধে পৌঁছেছিল সে-সময়।

আরও মনে হয়েছিল আসামের এই ষাটের কবিদের : সত্য শুধু নিজের জীবনে— কবিতা আত্মকথনমূলক, এখানে আমরা কলকাতা কিংবা অন্য যে-কোনো অঞ্চলের কবিদের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করি। বাংলা কবিতার মূল ধারা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই— শুধু ছড়িয়ে রয়েছি মাত্র। আর এই ছড়িয়ে থাকার ফলে কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে আমাদের জীবনযাপন কিছু আলাদা। এই সমস্ত আধুনিক চিন্তাভাবনা, উল্লিখিত জীবনযন্ত্রণা নিয়েও আমরা এক বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে একটা শান্ত দিকও খুঁজে পাচ্ছিলাম। আমাদের প্রেম কিংবা বিষাদ, ক্রোধ, ঘৃণা ও যন্ত্রণার সিঁড়ি ভাঙা, সর্বত্র জড়িয়ে থাকে এখানকার আলো-হাওয়া-রৌদ্র। জীবনের গতিবেগ এখনও এখানে তাল মিলিয়ে তেমন তীব্রতা আনতে পারেনি। যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাব ঘটেনি, কৃষি-সভ্যতা চলে গেছে। অন্তরঙ্গে যা-ই ঘটুক, আমাদের বহিরঙ্গে ততটা বিদ্রোহ হয়তো ধরা দেয়নি। কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত কী সুন্দর করে লিখলেন সেই কথা—

এই আলো হাওয়া রৌদ্রে চলাচল শুদ্ধ নিয়মে;

... ...

জ্যোৎস্নায় লুটপাট হয়, তবু বালা বসে তো চৌকাঠে,
বুকের আঁচল তার উড়ে যায় যেন এক দিগন্ত ভয়াল;

('সাহিত্য'-১, ১৯৬৭)

এই আলো হাওয়া রৌদ্রের কবিরা স্বকালে এবং স্ব-অনুভূতির কাছে সৎ থেকে নিজেদের কথা বলতে স্বভাবতই চিত্রকল্প এবং প্রতীক রচনায়, শব্দ-ব্যবহারে এবং মেজাজে কিছুটা ভিন্ন হলেন। দেখি এই ভুবনকে :

'মনের মধ্যে খুঁজলে পাবে আমার লেখা চিঠিপত্র'

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়

'বুকের ভেতর তাকালে সই এখনো ঠিক দেখতে পেতে
সেই পুরনো যাদুর বাঁশী বৃষ্টিমুখর কদম্ববন'

- উদয়ন ঘোষ

'তাকাও, যেমন তাকায় কথা মনের ভেতর, দেখতে পাবে
খড়ের ছাওয়া এই চালাঘর, উঠোন এবং স্বচ্ছ বাতাস'

- বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

একই সময়ে লেখা কলকাতা আর আসামের কবিতা— একই তো কথা— অথচ মেজাজে কত আলাদা। দুই ভুবনের যোগাযোগের সূত্র কত আলাদাহু

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালির এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা অন্য অঞ্চলের বাঙালির থাকার কথা নয়। কিছু বিশেষ শব্দ পর্যন্ত তাকে তাড়া করে অহর্নিশ : বিদেশী, বহিরাগত, ভূমিপুত্র— এ-সব শব্দ কবিকে ভাবায়। ত্রিপুরার স্বপন সেনগুপ্ত ষাটের দশকের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি লিখছেন—

'দৃশ্যত শান্ত আমি, নেই অভিমান
ভিতরে অঙ্গারে লাল অহর্নিশ

... ...

ক্ষোভ কিঞ্চিৎ আছে, ভূমিপুত্র আমি, ওখানেই বিদ্যাভ্যাস
প্রেম ও প্রণয়ে অধীর।'

(ভূমিপুত্র হও, ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী)

যা হোক, ত্রিপুরার কথায় আমি কিছু পরে আসছি। যে-কথা বলছিলাম তা-ই শেষ করি।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে আসাম অঞ্চলে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সব পত্রিকার নাম না-বললেও উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর এবং কবিদের কথাও কিছু বলেছি। এ-কথাও বলেছি যে 'অতন্দ্র' পত্রিকার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই অতন্দ্র ১৯৬৮-তে বন্ধ হয়ে যায়। কেন এমন হল? বিমল চৌধুরী লিখছেন, "১৯৬৮ তে আমরা অতন্দ্রের প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। না, অতন্দ্রের অপমৃত্যু হয়নি, রূপান্তর ঘটেছিল।... আসলে... সাহিত্য প্রকাশের পর অতন্দ্রের আর প্রয়োজন ছিল না বলেই আমরা মনে করলাম।" (সাহিত্য-৮৭) আর অন্য সম্পাদক শক্তিপদ বলছেন : "আবেগের দিনের মুখপত্র ছিল অতন্দ্র... অল্পদিনের মধ্যেই— মূলত পদ্যনির্ভর অতন্দ্র গদ্যনির্ভর সাহিত্যে বিস্তৃত হল।... অতন্দ্রকুলের বংশবৃদ্ধি এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করল সাহিত্য।" (শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর চিঠি, সাহিত্য-৮৭) আসলে অতন্দ্র-তে যার উত্তেজনাময় জন্ম ও শৈশব, 'সাহিত্য'-তে তারই ধীর পদক্ষেপে বেড়ে ওঠার

ইতিহাস— আর সে-ইতিহাসের ধারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে আসামে বাংলা কাব্যচর্চার জগতে নিত্য বহমান।

ষাটের দশকে আসামের বাংলা কাব্যচর্চা বাংলা সাহিত্যকে কী দিতে পেরেছে তার দলিল বলা চলে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আসামের নির্বাচিত বাংলা কবিতার সংকলন 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'। যে-গ্রন্থখানাকে মাঝখানে রেখে এপারে-ওপারে বাংলা কাব্যচর্চার দুটি পর্ব। দুই দশকের প্রথম পর্বটি যথার্থ ফসলে পরিপূর্ণ হয়েছিল ষাটের দশকে। 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংবাদে সনাতন পাঠক নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন— "একটি দুর্দান্ত বাংলা কবিতার বই। সত্যিকারের নতুন, সাহসী, সাবলীল ও জোরালো বাংলা কবিতার বই— কবিতাগুলি সম্পর্কে আমার প্রথম সম্ভাষণ : বিস্ময়কর। কাছাড়ে এই যে নবীন কবির দল কবিতা রচনায় মনপ্রাণ অর্পণ করেছেন এঁরা অচিরকালের মধ্যেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হবার অধিকার রাখেন।... এঁদের প্রত্যেকের নিজস্বতা অনস্বীকার্য।" অর্থাৎ বাংলা কবিতায় এই বিস্ময়কর কাজটি ঘটিয়েছিলেন আসামের, অর্থাৎ মূলত কাছাড়ের অতন্দ্র-সাহিত্য গোষ্ঠীর কবিরা। সংকলনের এই কবিরা হলেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, জিতেন নাগ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, উমা ভট্টাচার্য, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ, রণজিৎ দাশ আর মনোতোষ চক্রবর্তী। তবে সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব যাঁকে অবশ্যই যুক্ত করা উচিত ছিল তিনি কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। সে-সময় আমাদের বিবেচনায় তিনি ছিলেন কলকাতার কবি। আমরা ভুল করেছিলাম, যদিও তাঁরই কবিতার নামে বইয়ের নামকরণ করেছিলাম 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'। আরেকটি ভুল ছিল ডিব্রুগড়ের কবি উর্ধ্বেন্দু দাশকে অন্তর্ভুক্ত না-করা, কারণ অনেকদিন আমরা তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। অবশ্য পরবর্তী '৮৭ ইংরেজির সংস্করণে সেই ভুল আমরা শোধরাতে পারি। এই নিয়ে ষাটের সংসার।

৫

ওদিকে ত্রিপুরার বাংলা কবিতাও পঞ্চাশের শৈশব দ্রুত কাটিয়ে ষাটে এসে অসাধারণ তারুণ্যের পরিচয় দিল— বলা যায় এই দশকেই একসঙ্গে এল তারুণ্য ও যৌবন। এই দশকে এসেই ত্রিপুরার বাংলা কবিতার ধারাও বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় মিশে যায়। আমি বলব, যেমন আসাম অঞ্চলের, তেমনই ত্রিপুরার বাংলা কবিতা চর্চায়ও ষাটের দশক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দশক। কবিরা বাংলা কবিতায় তাঁদের সমসাময়িকদেরই সমকক্ষ হয়ে ওঠেন।

এই দশকেই ত্রিপুরার প্রথম কবিতার কাগজ 'জোনাকি' (১৯৬৩) প্রকাশিত হয় কৈলাসহর থেকে, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার সবচেয়ে পরিচিত কবি পীযূষ রাউতের সম্পাদনায়। ত্রিপুরার কাব্যচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। 'জোনাকি'র তিন বছর পরে ১৯৬৬-তে আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয় কবি স্বপন সেনগুপ্তের 'নান্দীমুখ'। পীযূষ, স্বপন কেবল ত্রিপুরারই নন, বাংলা সাহিত্যে ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি। বলা প্রয়োজন, এঁরা কেউ একা কাগজ করেননি, 'জোনাকি' ও 'নান্দীমুখ'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন আরও বেশ কয়েকজন তরুণ কবি। তাঁদের কথায় আমি পরে আসব।

১৯৬১ থেকে ১৯৭০ এই দশকে ত্রিপুরা থেকে যে-সব লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে 'সংহতি', 'দৃষ্টিকোণ', 'রত্নলিপি', 'জোনাকি', 'প্রদর্শন', 'শুভায়', 'ভাস্কর', 'উত্তরণ', 'গান্ধার', 'অরুণোপল', 'কোলাহল', 'নান্দীমুখ', 'অনির্বাণ', 'ঢেউ', 'কাকলি', 'জঠর', 'প্লাবন', 'ত্রিদিব', 'সৃজনী', 'সমাজ', 'নীহারিকা', 'আর্তনাদ', 'স্বাগতম', 'স্ফুরণ', 'তুলি', 'উদীচী', 'ত্রিভুজ', 'নন্দিনী', 'একাল', 'কাজের শেষে', 'নবারুণ', 'স্বকাল', 'পৌর্ণমী', 'দ্যুতি', 'জ্বালা', 'ব্রততী', 'অংকুর', 'খোয়াই', 'নবাগত', 'অরূপ'— এ-সবের নাম করতে হয় পরপর প্রকাশ কালের ক্রমে। এক দশকে এই চল্লিশটি কাগজের প্রকাশ আগের দশকের তিনটির তুলনায় যেন এক বিস্ফোরণ। আর যদিও অধিকাংশ পত্রিকাই আগরতলা শহর থেকে প্রকাশিত তবু আমরা দেখি কৈলাসহর, ধর্মনগর, খোয়াই, বিলনিয়া, অমরপুর কেউই পিছিয়ে নেই। আমরা টের পেলাম ত্রিপুরায় বাংলা কবিতার, বাংলা সাহিত্যের মুখ দ্রুত বদলে গেল। এ-কথা নিশ্চিত যে এই সময় থেকেই ত্রিপুরার ছোটপত্রিকা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে অন্য যে-কোনো রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তার পরেও বলতে হবে এতসব তরুণ-তরুণী যে নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে বলতে এগিয়ে এলেন, এ তো আর সরকার খুঁজে বের করেনি।

পীযূষ রাউত, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, প্রদীপবিকাশ রায়, বিমল দেব,

নিধু হাজরা, অনিল সরকার, কাজল পুরকায়স্থ, তাপস শীল, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, রাতুল দেববর্মন, অপরাজিতা রায়, করবী দেববর্মন প্রমুখ কবিদের তো আমরা ত্রিপুরার বাইরে বসেই চিনে নিলাম বাংলা সাহিত্যের কবি হিসেবে। পরবর্তীকালে কেউ বেশি কেউ কম খ্যাতি পেয়েছেন নিজেদের শক্তি অনুসারে, কিন্তু যৌথভাবে সমস্ত ত্রিপুরার মুখ তো তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পীযূষ স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ১৯৫৯ সালে কাছাড় থেকে কৈলাসহর গিয়েছিলেন। কাছাড়ের কবি করুণাসিন্ধুর বন্ধু সিতাংশু পাল ছিলেন পীযূষেরও বন্ধু— ওখানেই তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে সম্পর্কের শুরু। ১৯৬৩-তে কৈলাসহর থেকে পীযূষ যখন ত্রিপুরার প্রথম কবিতার কাগজ 'জোনাকি' প্রকাশ করেন তখন তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কবি মানিক চক্রবর্তী, প্রদীপবিকাশ রায় এবং শিল্পী-কবি বিমল দেবও। কৈলাসহরের একদল শক্তিশালী কবিগোষ্ঠীর কাগজ ছিল 'জোনাকি'। সে-সময় কৈলাসহরকে ভাবা হত ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান। ষাটের দশকে এই ভুবনে বাংলা কবিতায় যে-পরিবর্তনের জোয়ার আসে তাকে নিয়ে এসেছিল প্রধানত অতন্দ্র আর জোনাকি, সঙ্গে শিলচরের আরও কয়েকটি পত্রিকা— যেমন কালীকুসুম চৌধুরীর 'শ্রীভূমি', অতীন দীলারার 'শতাব্দী'। আর এই পরিবর্তনের ধারাকে ধারণ করে পুষ্ট করেছিল, স্থায়ী করেছিল আগরতলার 'নান্দীমুখ' (১৯৬৬ থেকে পঁচিশ বছর) এবং হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' (১৯৬৭ থেকে এখন পর্যন্ত যার নিয়মিত প্রকাশ চলছে)। কৈলাসহরের কবি কাজল পুরকায়স্থ সম্পাদিত 'কাকলি'-র কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। বলা চলে, ত্রিপুরার কবিতাচর্চার জগতে 'জোনাকি' এক নতুন আলো নিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ তো অনেক দূরে, তিরিশ-চল্লিশের কবিদেরও পেরিয়ে 'জোনাকি'-তে পড়েছে পঞ্চাশের, বিশেষ করে 'কৃত্তিবাস'-এর প্রভাব। এর দু-বছর আগে হাইলাকান্দির 'স্বপ্নিল' অবশ্য তাদের সহযাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল 'কৃত্তিবাস'-কে। কবিতা শুধু আত্মজীবনীমূলক, কবিতা লিখতে হবে মুখের ভাষায়, শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম এ-সব স্লোগানের প্রভাব 'জোনাকি'-তেও আমরা দেখেছি। আর পীযূষের কবিতার ভাষা তো আজও একেবারেই মুখের ভাষা। তবে না, কৃত্তিবাস তাদের গ্রাস করেনি, একটা স্মার্টনেস হয়তো দিয়েছিল— কিন্তু এই ষাটের কবিদের কেউ কেউ নিজস্ব একটা কাব্যভাষা আবিষ্কার করেছিলেন— আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও। ১৯৬৭ সালে 'জোনাকির বক্তব্য কী' প্রসঙ্গে সম্পাদক বলছেন : "প্রাচীন সৃষ্টির প্রতি যথাযোগ্য আন্তরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে তার থেকে পৃথক অথচ নতুন কিছু প্রকাশ করা। এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের খ্যাত এবং অল্পখ্যাত কবিদের সঙ্গে নতুন কবিদের পরিচয় স্থাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের কাগজকে বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার কবিদের মিলনতীর্থ বলে মনে করি। সম্ভাবনা রয়েছে অথচ সুযোগ নেই এমন তরুণ কবিদের রচনাকে পাঠক সমাজে পরিচিত করা...।" খুবই সহজ-সরল কথা, কোনো বড় তত্ত্বকথা বলার চেষ্টা ছিল না কোনো কালেই। প্রথমে পঞ্চাশের কবিতার দ্বারা কিছুটা আক্রান্ত হলেও ষাটের কবিরা কিন্তু বেশ সহজভাবেই কোলাহল থেকে সরে এসে অনুভূতির গভীরতার দিকে বাঁক নিলেন।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, একই বছরে প্রকাশিত কাছাড়ের অতন্দ্রের কবিরা ছিলেন আরেকটু পরিণত— কৃত্তিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব কিছু বক্তব্য কিংবা তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা কবিতায় এসেছিলেন— শুধু কিছু কবির মিলনতীর্থ গড়া কিংবা কিছু কবিকে পরিচিত করার বাসনা নিয়ে তাঁরা এলেন না, তাই তাঁদের কাব্যচর্চাকে আন্দোলন নামে অভিহিত করা হল— প্রথমে কাছাড় কাব্য-আন্দোলন, পরে অতন্দ্র কাব্য-আন্দোলন নামে।

যা হোক, আবার ত্রিপুরার কথায় আসি। সপ্তম দশকে ত্রিপুরার বাংলা কবিতার জগতে 'জোনাকি' থেকে আরম্ভ করে 'কাকলি', 'স্বাগতম', 'প্রদর্শন', 'গান্ধার', 'নান্দীমুখ', 'ঢেউ', 'জঠর', 'আর্তনাদ' ইত্যাদি পত্রিকা আশ্রয় করে যে-নবযুগের সূচনা হল তার নির্বাচিত রূপ আমরা দেখলাম ১৯৭৩ সালে স্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের কবিতা সংকলন 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'-তে। এই সংকলনের নির্বাচিত বারোজন কবি হলেন রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, মিহির দেব, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, মানিক ধর, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, পীযূষ রাউত, মানস দেববর্মন, প্রদীপবিকাশ রায় ও স্বপন সেনগুপ্ত। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে আমরা আগের দশকেই পেয়েছিলাম— বাকি নয়জন একেবারেই এই দশকের। এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল তরুণ কবি বলে পরিচিত হলেন।

এর পরে ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা আর পিছন ফিরে তাকাল না। আমরা একের পর এক পেয়ে গেলাম সমরজিৎ সিংহ, কাজল পুরকায়স্থ (শান্তনু ঘোষ যে-বছর কৃত্তিবাস পুরস্কার পেলেন সে-বছরই কাজলের নামও এ-অঞ্চলের প্রাথমিক নির্বাচন তালিকায় ছিল), হিমাদ্রি দেব, নকুল রায়, রাতুল দেববর্মনের মতো শক্তিশালী কবিদের। দশকে দশকে এই তালিকা দীর্ঘ হল যাঁদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসীম দত্তরায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, পল্লব ভট্টাচার্য, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, সন্তোষ রায়, দিলীপ দাশ, শুভেশ চৌধুরী, নকুল দাস, সেলিম মুস্তাফা, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, অশোক দেব, অপরাজিতা রায়, দেবাশিস তরফদার (ডাক্তার), তাপস রায়, প্রদীপ দত্ত চৌধুরী, কিশোররঞ্জন দে, কল্যাণ গুপ্ত, সনজিৎ বণিক, লক্ষ্মণ বণিক, দীপঙ্কর সাহা, সুবিনয় দাস, মৃন্ময় সেন, সুনীল ভৌমিক, দেবাশিস ভট্টাচার্য, মলয় চক্রবর্তী, মাধব বণিক, দেবাশিস চৌধুরী, স্বাতী ইন্দু, প্রত্যুষ দেব, কৃষ্ণধন আচার্য, গোবিন্দ ধর, শিশিরকুমার সিংহ, শংকর বসু, সিরাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। এই তালিকা বয়সের ক্রম মেনে নয়, আমার জানার ক্রম অনুযায়ী।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষ দশকে (আগস্ট ১৯৯০) এসে ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্ব-নির্বাচিত কবিতা সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে শিশিরকুমার সিংহ লিখলেন, "দুঃখের বিষয় এই যে, কিছুকাল আগেও এখানকার সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তেমন মনোযোগ বা কৌতূহল মূলধারার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।" শিশিরবাবুর মূল ধারার কবি-সাহিত্যিক কারা আমরা জানি না, তবে আমি মনে করি গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে বাংলা কবিতার জগতে যখন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষণ স্পষ্ট হল, তখন থেকে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা ধারণ করল সারা ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন। আজও তা-ই রয়েছে— লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ধারাই বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত আর এই স্রোতের অংশীদার ত্রিপুরার কবিতাও সেই সপ্তম দশকেই। ত্রিপুরার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম স্বপন সেনগুপ্ত তাই বলেন— "বাংলা কবিতার মূল স্রোতে সহাবস্থান করলেও ত্রিপুরায় একমাত্র বিক্ষিপ্তভাব কবিতায় ও গদ্যে হাংরি জেনারেশনের অভিঘাত ছাড়া আর কোন আন্দোলন দাগ কাটেনি কখনো।...

"...আধুনিক জীবনের সমবয়সী বিষাদ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও দ্বন্দ্ব যন্ত্রণায় নিয়ত বিকিরণ ঘটছে ত্রিপুরার কবিতায়। দাঁতাল হিংস্র সময়ের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে সটান দাঁড়ানোরই অন্য নাম শ্রেণী সংগ্রাম। পূর্বোত্তরের কবিতাকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক ভাবতে পারেন না বাংলা কবিতার সামগ্রিক বিকাশ ও চিত্রকল্পের কথা।"[৬]

এখানে একটা কথা খুব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বাংলা কবিতার মূল স্রোতে সহাবস্থান মানে এই নয় যে কলকাতা কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলের আন্দোলনের অভিঘাত পড়তে হবে এখানে কিংবা এও নয় যে এ-অঞ্চলের আন্দোলনের অভিঘাত পড়তে হবে কলকাতা অঞ্চলের কবিতায়। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে কলকাতায় কিংবা তার আশেপাশে কবিতার দিনবদলের যে-সব আন্দোলন হয়েছে তাদের অনেকগুলোর নাম কলকাতার প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা জেনে গেছেন। হাংরি জেনারেশন, নিম সাহিত্য, শ্রুতি, শাস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন— কত নাম, যদিও আজ তারা সব মিলেমিশে একাকার, তবু কলকাতাকেন্দ্রিক বহু আলোচনায় এ-সব নাম আজও শোনা যায়। অথচ একই সময়কালে বর্তমান বরাক উপত্যকায় স্বপ্নিল-অতন্দ্র-সাহিত্য-শতাব্দী ইত্যাদি পত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলা কবিতার জগতে যে-পরিবর্তন আসে— যাকে অতন্দ্র কাব্য-আন্দোলন কিংবা কাছাড় কাব্য-আন্দোলন নামে অনেকে চিহ্নিত করেছেন— যার প্রথম ফসল 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' প্রকাশিত হতেই কলকাতার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক পত্রিকাও এই কবিদের সে-সময়ের বাংলা কবিতার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছিল, সেই আন্দোলনের কথা আজকের বাংলা সাহিত্যের রাজধানীর আলোচকেরা চেপে যান। তাঁরা জোনাকি-নান্দীমুখ-কাকলি-স্বকাল-পৌণমী-ত্রিভুজ ইত্যাদি পত্রিকা নিয়ে ত্রিপুরায় বাংলা কবিতার যে-দিনবদল ঘটে তার কথাও দিব্যি ভুলে যান। অষ্টম, নবম কি দশম দশকে যা-ই হোক, সপ্তম দশকেই কিন্তু ত্রিপুরার পীযূষ, স্বপন, প্রদীপবিকাশ, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব কিংবা কল্যাণব্রতরা তাঁদের পত্রপত্রিকায় এবং 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'-র মতো একটি উঁচুমানের সংকলনের জন্য বাংলা কবিতার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে থেকে

আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শক্তিশালী কবি স্বপন সেনগুপ্তের নান্দীমুখে কোনো-না-কোনো সময়ে লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের কোন্ ভালো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখেননি পীযূষ রাউত, আর হাংরির দৌলতে প্রদীপ চৌধুরী তো ছিলেন বহু-আলোচিত।

এঁদের পর যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার বাইরে হয়তো সবচেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছেন সমরজিৎ সিংহ কিংবা প্রবুদ্ধসুন্দর, কিন্তু এই সময়ের আরও যে-কবিদের নাম আমি আগেই করেছি তাঁরা তো রচনার গুণগতমানে এ-দুজনের কেবল সমকক্ষই নন, অনেকে তো মনে হয় আরও বেশি স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন, আর বস্তুত ত্রিপুরায় কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাও পেয়েছেন।

সেলিম মুস্তাফা নামে একজন কবিকে দেখি ত্রিপুরার কবিতার সংকলকরা নিয়মিত অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করা ঠিক নয় বলেই আমি মনে করি। হ্যাঁ, একমাত্র ত্রিপুরাতেই, যেখানে হাংরি জেনারেশনের একটা স্রোত নেমে এসেছিল কলকাতা থেকে, গদ্যেপদ্যে আমরা তেমন কিছু লোককে পাই যাঁরা নিজেদের হাংরি বলে পরিচিত করেছিলেন এবং এখনও করছেন; জানি তাঁরা ত্রিপুরার বাংলা কবিতার মূল ধারায় নেই, তবু তাঁরা কোন্ তত্ত্বের কথা বলেন সে-কথা না-ভেবে যদি আমরা তাঁদের কবিতা দিয়ে বিচার করি, তাহলে তাঁদের সকলকে অস্বীকার করতে পারি না।

কলকাতার অনুকরণ করে মূল স্রোতের অংশীদার হওয়া নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, আসাম-ত্রিপুরার কবিরা চিন্তাচেতনা, যুগের ভাবনার দিক থেকে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অঞ্চলের কাব্য-ভাবনার সমসাময়িক, আর সেইসঙ্গে বাংলা কবিতায় যোগ করেছিলেন এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও। দিকে দিকে বাংলা কবিতার চর্চা গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল নানাভাবে। ত্রিপুরা সেখানে ছিল অন্যদের যোগ্য সহযাত্রী।

৬

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কেবল শিলং এবং কাছাড়ই নয়, গুয়াহাটি শহরেও বাংলা কাব্যের আধুনিকতার ঢেউ লাগে প্রধানত বিশ্বজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'সময়' পত্রিকার হাত ধরে। বিশ্বজিৎ চৌধুরী গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, উদয়ন, আমি আর শান্তনু গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থাৎ অতন্দ্রের একটা অংশ গুয়াহাটিতেও সক্রিয়। জিতেন নাগও যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে।

সুতরাং গুয়াহাটি আর জালুকবাড়ির বিভিন্ন স্টলে তখন অতন্দ্রের আড্ডা জমে উঠত। অধ্যাপক-কবি হীরেন দত্ত কিংবা অধ্যাপক-ছোটগল্পকার ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার একাধিক আড্ডায় সে-কালের অসমিয়া সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ঘটে বাংলা কবিতার। সেই যোগ নানা সময়ে মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে আসামের বাংলা কবিতায়। বিশেষ করে উদয়ন, শান্তনু ও আমার কবিতায় সে-কালের ও স্থানের অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই ধরা পড়েছে। বলা চলে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে অতন্দ্র তখন যতটা শিলচরে ততটাই গুয়াহাটিতেও। অবশ্য গুয়াহাটিতে তখন স্থানীয় বাঙালিদের উদ্যোগে কোনো বাংলা কবিতার কাগজ জন্ম নেয়নি। যদিও শিব ভট্টাচার্য, অখিল দত্ত, সুভাষ কর্মকাররা জন্ম দিয়েছিলেন 'একাল' বলে উল্লেখযোগ্য গল্প-পত্রিকার।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত থেকে শুরু করে আসামের এই ষাটের দশকের অনেকের কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমি আমার 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের দুই খণ্ডে তাঁদের অনেককে নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু আপাতত দেখি গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে আমরা কী পেলাম, কাদের পেলাম।

'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র প্রথম প্রকাশের পরবর্তী তিন দশক ধরে আসামে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে যেমন 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র কবিদের ক্রমবিকাশ লক্ষ করি, ঠিক সে-ভাবেই লক্ষ করি একের পর এক কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং তাঁদের নতুন নতুন পত্রিকার প্রকাশ। আগে লিখেছিলাম যে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' গ্রন্থখানাকে মাঝখানে রেখে কাছাড় কাব্য-আন্দোলনের দুটি পর্ব। এবারে বলব— কেবল কাছাড় কাব্য- আন্দোলন নয়, বৃহত্তর আসামের কাব্যচর্চারও দুটি পর্ব এই গ্রন্থটি ভাগ করেছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তৎকালীন (২০০৫) প্রধান ড. সুবীর কর লিখলেন, "এই 'আলো হাওয়া রৌদ্রে'র আত্মপ্রকাশ কাছাড়ের কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল।" লিখলেন, কারণ কাব্য-সংকলনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকল। যা দিল এই নতুন দিগন্তের সন্ধান।

পরবর্তী পর্যায়ের কাব্য-আলোচনায় এই দ্রুত ঘটে-যাওয়া

ঘটনাগুলোর প্রভাব অনেকখানি।

'দেশ' পত্রিকা যখন বলল কাছাড়ের এই কবিরা বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হবার অধিকার রাখেন তখন এ-অঞ্চলের পাঠকের কাছে এবং বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যেও আসামে রচিত বাংলা কবিতার মান এক লাফে অনেকটা উঠে গেল। মাত্র ছ-মাসের মধ্যে কাছাড়, শিলঙের বইয়ের দোকানের মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ সম্পূর্ণ বিক্রি হয়ে গেল। (পঁচিশ বছর পর যখন বিশ্বজ্ঞান সংস্করণ বেরোল তার বিক্রিও হয়ে গেল খুব দ্রুত।)

এতে বাংলা কবিতার জগতে যে-গুডউইলটা তৈরি হল সেটা নতুন-পুরনো সবাইকে প্রভাবিত করল— কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের এক নবযুগ এল এ-অঞ্চলে। নতুন নতুন পত্রিকা, নতুন কবিগোষ্ঠী এলেন কেবল কাছাড়ে নয়, সমস্ত আসামে। পশ্চিমবঙ্গের বহু কাগজ কেবল কাছাড়ের কবিদের কবিতা নিয়েই ছাপতে আরম্ভ করলেন না, এ-অঞ্চলের কবিতা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার জন্যও আমন্ত্রণ আসতে লাগল নিয়মিত। ১৯৬৭ সালে তারাপদ রায়ের অনুরোধে তৎকালীন 'আসামের আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখি তাঁর 'কয়েকজন' কাগজে। এই প্রবন্ধটা সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধটি এবং তার কয়েক বছর আগে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় রামেন্দ্র দেশমুখ্য ও সুধীর সেনের প্রবন্ধ 'কবির শহর শিলচর' বাঙালি পাঠককে এ-অঞ্চলের কবিতা সম্পর্কে আগ্রহী করেছিল — এবং এই আগ্রহটা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিল 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'।

আরেকটা ঘটনার কথা বলি। এই সময় আসামের কবিদের কিংবা কলকাতার বাইরের তরুণ কবিদের যতই পরিচিতি ঘটুক-না কেন, বাংলা কবিতার সংকলনগুলো তখনও একান্ত ভাবেই কলকাতা-কেন্দ্রিক। সাহিত্য-১০-এ 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সংকলন' নামে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখলাম। তাতে প্রকাশিত সংকলনগুলির ত্রুটি দেখিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের কাছে অনুরোধ রাখলাম 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র মতো তাঁরাও যেন নিজ নিজ অঞ্চলের প্রধান কবিদের নিয়ে সংকলন প্রকাশ করেন। তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংকলনের পাশাপাশি এইসব আঞ্চলিক সংকলন মিলিয়ে পাঠক বাংলা কবিতার একটি সম্পূর্ণ মুখ দেখার সুযোগ পাবেন।

দু-এক বছরের মধ্যে জামশেদপুর থেকে কমল চক্রবর্তী 'কৌরব' নামে একটি সংকলন করলেন, স্বপন সেনগুপ্ত করলেন ত্রিপুরার কবিতা নিয়ে 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', মেদিনীপুরের কবিতা নিয়ে গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন সংকলন 'চান্দ্রমাস'। চান্দ্রমাস-এ গৌরশংকর তো সাহিত্যে প্রকাশিত অনুরোধটাও ছাপিয়ে দিলেন গ্রন্থের চতুর্থ কভারে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' এবং 'সাহিত্য' পত্রিকার একটা প্রভাব পড়ল দূরে দূরে— মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে শ্যামলকান্তি দাশ, মহিষাদল থেকে গৌরশংকর, কলকাতা থেকে অরণি বসু, উত্তরবঙ্গ থেকে পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত এবং আরও অনেক তরুণ কবির কবিতা আসতে শুরু করেছে সাহিত্যে।

অতন্দ্রে যার জন্ম এবং উত্তেজনাময় শৈশব, সেই কাব্য-আন্দোলনের উত্তজনাহীন এবং ধীর পদক্ষেপে বিকাশ ঘটেছিল 'সাহিত্য'-তে সে-কথা সকলেই লক্ষ করলেন। আর নতুন নতুন পত্রিকা তো এলই, 'সাহিত্য'-পরিবারে জন্ম নিতে লাগলেন নতুন নতুন কবিরা, পুনর্জন্ম ঘটল পুরনো অনেক কবির।

১৯৭০ সালেই 'সাহিত্য'-তে দেখা দিলেন নতুন দুই কবি, দিলীপকান্তি লস্কর আর অমিতাভ চৌধুরী (অমিত চৌধুরী); পরের বছর দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, '৭৩-এ সমরজিৎ সিংহ, '৭৪-এ ভক্ত সিং আর আশুতোষ দাশ। ১৯৭৪ সালেই এলেন শিলঙের কবি রমানাথ ভট্টাচার্য, কবি দেবাশিস তরফদার। দেবাশিস এলেন খুব সাড়া জাগিয়ে। প্রথম প্রকাশেই সাহিত্যে তাঁর গুচ্ছকবিতা ছাপা হল। অতন্দ্র-সাহিত্যের কবিদের সঙ্গে তরুণদের মিলনে এক নতুন সাহিত্য-পরিবার গড়ে উঠল যা কালে কালে বড় হয়ে আজও বর্তমান।

তবে এও ঠিক সাহিত্যে যাঁরা এলেন, সকলেই সাহিত্য-পরিবারে যুক্ত হলেন না, হয় নিজেরা পত্রিকা করলেন অথবা মুক্ত রইলেন সকল গোষ্ঠী থেকেই।

১৯৭০-এর শেষার্ধে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হল একটি ছোট্ট পত্রিকা 'পাঁক ঘেঁটে পাতালে'। পরে নাম হল 'রেণসাঁ'— সম্পাদনায় 'ত্রয়ী' মানে বাহারউদ্দিন, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য (যিনি প্রকাশক হিসেবে প্রথম যুক্ত ছিলেন সাহিত্যে) আর তড়িৎ চৌধুরী। হ্যাঁ, আজকের গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক উষারঞ্জন তখন কবিতা লিখেছেন। 'রেণসাঁ'-র ত্রয়ী বাংলা সাহিত্যের সে-সময়ের

প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে ছিলেন খুবই পরিচিত, তবে আসামে এই গোষ্ঠীই একমাত্র যাঁরা হাংরি কিংবা নিম সাহিত্য, না-সাহিত্য, অল্প-সাহিত্য প্রভৃতি উত্তেজক ধারাগুলির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত যুক্ত। হয়তো এ-বিষয়টা তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন। তিন বছর বাদে সপ্তম সংকলনে বলছেন, "রেণসাঁ কথা বলবে নিজের মতো করে, বিলম্বিত কোন দীর্ঘছায়ার স্পর্শ থেকেও তাকে আমরা মুক্ত রাখব।" এই-যে সম্পূর্ণ নিজেদের মতো কথা বলা, নিজেদের আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে কথা বলা— এটা আসামের বাংলা কবিতার বিশেষ লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ-জাত বিভিন্ন আন্দোলন ত্রিপুরায় যতটা প্রশ্রয় পেয়েছে আসাম অঞ্চলে তা পায়নি। এমন-কি তপোধীরের মতো উত্তরাধুনিকের অন্যতম প্রবক্তাও বরাকের তরুণ শক্তিশালী কবিদের প্রভাবিত করতে পারেননি। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আসামের বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। তবে এ-কথাও নিশ্চিত সত্য যে পৃথিবীর বুকে যেখানেই কোনো সার্থক কিংবা অসার্থক আন্দোলনই গড়ে উঠুক— সব কিছুরই একটা দাগ থেকে যায় অন্যদের উপর। বাংলা কাব্যের যত আন্দোলন কিংবা আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যত রাজনৈতিক, সামাজিক, ভাষাপ্রেমের কিংবা উগ্রতার আন্দোলন কোনো কিছুই আমাদের জীবনকে ছেড়ে দেয় না— বরং এক নতুন রূপে গড়ে তোলে।

মেঘালয় সৃষ্টির পর আসামের রাজধানী যখন গুয়াহাটিতে চলে গেল তার পরে বিশেষভাবে গুয়াহাটি শহর বাংলাচর্চার একটি কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। একসময় কাছাড় জেলা, তারপর শিলং, ডিব্রুগড়, যোরহাট, এমন-কি ডিগবয়ের নামও আসত কিন্তু পুরনো গুয়াহাটির ভূমিকা ছিল গৌণ। বর্তমানে গুয়াহাটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর, বিভিন্ন দিকে তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়ও মহানগর গুয়াহাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

গুয়াহাটির 'প্রাচী ধরিত্রী' শরৎ ১৩৯৭ (১৯৯০) সংখ্যায় গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা থেকে দেখি, হাইলাকান্দি থেকে 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশের (১৯৬৭) আগে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র দশ, পরবর্তী পঁচিশ বছরে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ। বলা চলে পত্রিকা প্রকাশের বিস্ফোরণ, যা আমরা কাছাড়ে দেখেছি পঞ্চাশের দশকে, ত্রিপুরায় ষাটের দশকে।

'সময়', 'পাঁক ঘেঁটে পাতালে', 'রেণসাঁ'-র কথা বলেছি, আরও যে-সব পত্রিকা প্রকাশনার উন্নতমানের জন্য পাঠকের কাছে যথেষ্ট মূল্য পেয়েছে, তাদের মধ্যে আছে 'একা এবং কয়েকজন', 'কিন্নরকণ্ঠ', 'পূর্বমেঘ', 'পূর্বা', 'প্রাচী ধরিত্রী', 'শব্দ', 'শিলালিপি', 'স্বরের আড়ালে শ্রুতি', 'মহাবাহু', 'পত্রপুট', 'মাজুলি' ইত্যাদি।

'পাঁক ঘেঁটে পাতালে'-'রেণসাঁ'র পরে পরে যোরহাটে এল 'মজলিশ', কাছাড়ে 'শতক্রতু'। মজলিশ-এ যেমন ষাটের দশকে হারিয়ে-যাওয়া কবি ঊর্ধ্বেন্দু দাশকে পুনর্বার পেলাম, পেলাম নতুন কবি দীপঙ্কর নাথ, নারায়ণ দাশ, কমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং জীবনজ্যোতি দেবকে। ওদিকে গদ্যপ্রধান 'শতক্রতু' উপহার দিল কবি তপোধীর ভট্টাচার্য এবং কবি অরুণ চন্দকে (অকালপ্রয়াত)। একসময় ত্রিপুরার কবি সমরজিৎ সিংহ, যোরহাটের দীপঙ্কর মিশে গেলেন 'শতক্রতু'-র দলে। এই সময়ের কবি করুণাকান্তি দাশ, মহুয়া চৌধুরীরাও।

শিলং থেকে আত্মপ্রকাশ করেছেন রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর সত্তরের গোড়ায়। তাঁদের পত্রিকা 'ঋতুরঙ্গ', 'শিলঙের কবিতা', 'পাহাড়িয়া' একের পর এক প্রকাশিত হল। এদিকে শিলঙে তখন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত সবার মাথার উপরে, আছেন উদয়ন ঘোষও। বীরেন্দ্রনাথদের পত্রিকা 'পূর্ব ভারতী' অনেক আশা জাগিয়েছিল সত্তরের দশকের শুরুতে। শিলঙে চাকরিসূত্রে এলেন মৃণাল বসু চৌধুরী, 'দেশ' পত্রিকার উপর অভিমান করে 'দেশান্তর' নামে কবিতার পত্রিকা করলেন। তিনি সাহিত্যের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন কিছুকাল। মৃণাল বদলি হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর এলেন শংকর চক্রবর্তী, তিনি প্রকাশ করলেন 'শতাব্দী' নামে কবিতার কাগজ। আসামের দ্বিতীয় 'শতাব্দী', প্রথম 'শতাব্দী' শিলচরের অতীন দাশ, দীলারা, গণেশ দে-র কাগজ। হাইলাকান্দিতেও আশুতোষ দাসের নতুন কাগজ 'বেলাভূমি' প্রকাশিত হল সম্ভবত ১৯৭৬-এ। এই পত্রিকার নিয়মিত কবিদের মধ্যে ছিলেন ভক্ত সিং, মাসুক আহমেদ, রামরঞ্জন চক্রবর্তী। আরও পরে আশির দশকে এলেন তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ, কৃষ্ণা মিশ্র, কল্লোল চৌধুরীরা।

করিমগঞ্জ থেকে ষাটের অন্তিম লগ্নে প্রকাশিত হল পঞ্চমিত্র সম্পাদিত 'উদর্ক' পত্রিকা। পঞ্চাশের দশকের অতুলরঞ্জন দেব

এই পত্রিকার প্রধান কবি। সত্তরের দশকেই করিমগঞ্জে পেলাম আরেক কবিকে, তিনি জন্মজিৎ রায়। যা হোক আমরা দেখছি, কাছাড় সহ আসামের বিভিন্ন স্থানে এলেন অনেক নতুন কবি— শুরু হল ষাটের কবিদের পাশাপাশি একদল নতুন এবং সত্যিকারের শক্তিশালী কবিদের যাত্রা।

তাহলে সত্তরের দশকে নবাগত উল্লেখযোগ্য কবিদের তালিকা হবে এ-রকম— দিলীপকান্তি লস্কর, অমিত চৌধুরী, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, বাহারউদ্দিন, দীপঙ্কর নাথ, তপোধীর ভট্টাচার্য, ভক্ত সিং, আশুতোষ দাস, দেবাশিস তরফদার, সমরজিৎ সিংহ, রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর, জন্মজিৎ রায়, করুণাকান্তি, মহুয়া চৌধুরী প্রমুখ। এ ছাড়া পঞ্চাশের দশকে কিংবা ষাটের গোড়ায় ভালো কবিতা লিখেও যাঁরা আত্মগোপন করে ছিলেন তেমন কয়েকজনকে পেলাম সত্তরের দশকে।

সত্তরের দশক গেল। আশির দশকে একেবারে গোড়ায় শিলচর থেকে পেলাম পরপর আরও দুটি পত্রিকা— 'ইত্যাদি' ও 'প্রতিস্রোত'। পত্রিকা দুটি নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ছোট পত্রিকার কথা' প্রবন্ধে।[৭] এই পত্রিকাগোষ্ঠীর হাত ধরে যে-কবিরা এলেন তাঁরা হলেন বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শঙ্করজ্যোতি দেব, জয়দেব ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম মৈত্র, মঞ্জুগোপাল দেব, সৌমিত্র বৈশ্য, বনানী ভট্টাচার্য, স্বর্ণালী বিশ্বাস (বর্তমানে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পদবি ভট্টাচার্য), ভাস্করজ্যোতি দেব, সুজিৎ দাস, শেলী দাস চৌধুরী, স্মৃতি পাল নাথ প্রমুখ।

'প্রতিস্রোত' প্রকাশ করেছিলেন 'ইত্যাদি' থেকে সরে-আসা পার্থপ্রতিম মৈত্র, সুজিৎ দাস, ভাস্করজ্যোতি দেব, পরম ভট্টাচার্য এবং প্রদীপ পাল প্রমুখ বারোজন কবি ও গল্পকার। আশির দশক থেকেই আরও কয়েকটি পত্রিকা করিমগঞ্জের 'শরিক', 'লালনমঞ্চ', শিলচরের 'মা নিষাদ', 'অনীশ্বর', শিলচর ও হাফলং থেকে প্রকাশিত 'জাতিঙ্গা', হাইলাকান্দি থেকে 'প্রবাহ', 'চম্পাকলি' এমনই আরও বেশকিছু নতুন পত্রিকা পেলাম। যে-সব নতুন কবিদের পেলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বজিৎ চৌধুরী (অতন্দ্রের বিশ্বজিৎ নন), সুব্রতকুমার রায়, দেবাশিস চন্দ, তুষারকান্তি নাথ, আশিস নাথ, জালাল উদ্দিন লস্কর, জসীম উদ্দিন লস্কর, দীপালি দত্ত চৌধুরী, জগদীশ চক্রবর্তী, আবুল হোসেন মজুমদার প্রমুখ। বদরপুরের কবি কিরণশংকর রায় প্রায় ষাটের কবিদেরই সমসাময়িক, আর পাঁচগ্রামের কাব্যশ্রী ভট্টাচার্য বক্সীও বোধহয় গত শতাব্দীর শেষ দশকেই বিশেষভাবে প্রকাশিত হলেন।

গুয়াহাটির অজিত দত্তই প্রথম সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের কবিতার একটি সুসম্পাদিত সংকলন প্রকাশ করেন ১৯৮৩ সালে। আমার মনে হয় এটাই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতার শ্রেষ্ঠ সংকলন। এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে আমরা জেনেছিলাম "পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ গৌহাটী থেকে সূর্য্য নামে একটি উচ্চমানের সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী। পত্রিকাটি কবিতা বিষয়ক না হলেও ঐ সময়কার বাংলা কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অবশ্যই। কালাচাঁদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অমলেন্দু গুহ, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ভরত ঘোষ, নিখিল চক্রবর্তীর মতো শক্তিশালী কবিরা নিয়মিত কবিতা লিখতেন এই পত্রিকায়। ষাট ও সত্তরের দশকের মধ্যে গৌহাটী থেকে প্রকাশ পেয়েছিল সুনীতি সেন সম্পাদিত সপ্তপর্ণ; বিদ্যুৎবরণ কুণ্ডু, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও মনীশ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল সাথী, বিপ্লব ঘোষ ও উদয়ন বিশ্বাস সম্পাদিত ইদানীং ও বেতাল গোষ্ঠী সম্পাদিত অধুনা।"

কমল সাহা, বিশ্বজিৎ নন্দী এবং হেলালুজ্জামান সম্পাদিত 'গারো পাহাড়ের কবিতা' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে গারো পাহাড়ে বাংলা কবিতা চর্চা বেশ উন্নত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এক-একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। 'মেঘালয়' সৃষ্টির পর গুহায়াটিতে বাংলা সাহিত্য চর্চার উন্নতি আমরা আগেই লক্ষ করেছি, একই ভাবে গারো পাহাড়ে যে বাংলা কবিতার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যাবে না। 'গারো পাহাড়ের কবিতা' সংকলনে সংকলিত কবি চোদ্দজন, কবিরা হলেন— কমল সাহা, হেলালুজ্জামান, জগদীশ বর্মন, বিশ্বজিৎ নাগ, প্রাণেশ কর, নবগোপাল দেব, কানুপ্রসন্ন চৌধুরী, মলয় নাগ, মজীদুর রহমান লস্কর এবং বিশ্বজিৎ নন্দী প্রমুখ। বিশ্বজিৎ নন্দী সহ আরও কেউ কেউ এখন বাংলা কাব্যে বেশ পরিচিত নাম।

যদিও একসময়ে এ-অঞ্চলের কবিরা প্রধানত লিট্‌ল ম্যাগাজিন আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের কথা জানতে হলে লিট্‌ল ম্যাগাজিনই ছিল একমাত্র ভরসা, কিন্তু

আমরা দেখলাম সত্তরের দশকের শুরু থেকে প্রধান অপ্রধান কবিদের নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশেরও জোয়ার এল। প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল সম্পাদিত কাব্য-সংকলনও। কিছু কাব্য-সংকলনের নাম আমরা করতে পারি যা আগ্রহী পাঠককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতার একটা পরিচয় দিতে পারবে। ১৯৬৯-এ 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র কথা বলেছি; এরপর ১৯৭৩-এ স্বপন সেনগুপ্তের 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'— বই দুটি যথাক্রমে আসাম ও ত্রিপুরার বারোজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কবিতার সংকলন। ১৯৮৩ সালে পেলাম 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' সংকলন, যার সম্পাদক কুমার অজিত দত্ত। আসাম ত্রিপুরা মিলিয়ে মোট চুয়ান্নজন কবি। ১৯৮৭-তে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র পরিবর্ধিত (বিশ্বজ্ঞান) সংকলন। নতুন যে-কবিরা যুক্ত হলেন তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ছবি গুপ্তা, ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর নাথ, আশুতোষ দাস, ভক্ত সিং, দেবাশিস তরফদার, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম মৈত্র, শঙ্করজ্যোতি দেব ও জয়দেব ভট্টাচার্য। ১৯৯০ সালে শিশিরকুমার সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' (৪১ জন কবি)। ১৯৯১ সালে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও বিশ্বতোষ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল কেবল বরাক উপত্যকার চুরাশি জন কবির কবিতা-সংকলন 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ'। তারপর গত শতাব্দী যখন শেষ হবার পথে (১৯৯৯) তখন স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হল, কবির সংখ্যা মাত্র ছত্রিশ। গত শতাব্দীতে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা থেকে বাছাই করে 'নির্বাচিত সাহিত্য-১, বাংলা কবিতা' গ্রন্থটি যখন আমরা প্রকাশ করি সেই সংকলনের কবির মধ্যে ৫১ জনই ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। বাকি চুয়ান্নজন পশ্চিমবঙ্গ বা তারও পশ্চিমের। আর ২০০৩-এ প্রকাশিত 'গারো পাহাড়ের বাংলা কবিতা' গ্রন্থটির উল্লেখ আগেই করেছি।

এর বাইরেও আরও কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এইসব সংকলন বাদ দিয়েও কবিদের নিজস্ব গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। হ্যাঁ, এত কবি, এত কবিতা গত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে আমরা পেয়েছি আসামে। এত কবিতা যখন আলোচ্য তখন একটি স্মারক বক্তৃতায় সকলের কথা বলা যে প্রায় অসাধ্য সে নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না। আর আমার বক্তব্য আমার বিচারের মধ্যেই থাকবে এও স্বাভাবিক। আমি সেই বিচারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

বাংলা সাহিত্যে, আমার আলোচ্য সময়ে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতার মূল চরিত্র এবং কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এতক্ষণের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আরও কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা এবার বলি।

স্বাধীনতা ও দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে আসাম রাজ্যে বাঙালিরা যে-অমানবিক ব্যবহার পেয়েছেন, ভারতে আর-কোনো জাতিকে তা সহ্য করতে হয়নি এবং এখনও তা সমানভাবে চলছে। এ-সব নিয়ে আমি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বাঙালি যখন মাতৃভাষা রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছে তখন আমাদের মতো কবিদের মনে হয়েছিল, এ-অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যচর্চা যদি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদা পায় তবে আসামের বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। সেই ভাষার প্রতি ভালোবাসা-বোধ থেকে নতুন নতুন ভাবনায় কাব্য-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা জুগিয়েছিল— ষাটের কবিরা তাই নিজেদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের কলকাতা-কেন্দ্রিক কবিপাঠকসমালোচকদের। কিন্তু আরও কিছুদিন পরে দেখা গেল, কেবল এখানেই শেষ নয়, প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধের এবং প্রতিবাদের ভাষাও জন্ম নিয়েছে এ-অঞ্চলের বাংলা কবিতায়। উনিশের কবিতা ও গানের সংকলন করেছেন দিলীপকান্তি লস্কর ২০০৩ সালে, অতীন দাশও সম্পাদনা করেছেন '১৯শের কবিতা' নামে একটি সংকলন এই কিছুদিন আগে। এ-সব কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে, একেবারে নতুন। কোনো অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যে এমনটা পাওয়া যাবে না।

আজকাল সরকারি দপ্তরে 'ভ্রষ্টাচার' নিয়ে দেশে বিরাট আন্দোলন হচ্ছে। অথচ স্বাধীনতার এক-দেড় দশক পরেই এই দুর্নীতির ব্যাপকতা আরম্ভ হয়, এবং আসাম তাতে বোধহয় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। টাকার বদলে স্কুলের চাকরি কেনা সেই ৫৯-৬০ সালেই আসামে আরম্ভ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তো এই চাকরি-বাণিজ্যের কথা এখনও (২০১১) তেমন জানেন না। আসামে রচিত বাংলা গদ্যে তার বর্ণনা আছে, অতন্দ্রের কবিরা এ-সব দেখেই কিছু কিছু কবিতায় তাঁদের ঘৃণা, ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

তারপর আসি ভাষার আঞ্চলিক রূপের কথায়। আমরা আজ যাকে উপভাষা বলতে শিখেছি, রবীন্দ্রনাথ তাকে উপভাষা বলেননি। কারণ উপভাষা শব্দের মধ্যে একটি কথা লুকিয়ে আছে— তা হল একটি মূল ভাষা আছে। আসলে একই ভাষার নানারকম রূপ থাকে ভাষা ব্যবহারের অঞ্চল ও লোকসংখ্যা বৃহৎ হলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাংলাভাষার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতের কথা— যার একটি বিশেষ প্রাকৃত চলছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা হল একটা বিশেষ প্রাকৃতকে মান্যভাষা বলে মেনে নিলেও, শক্তিশালী লেখকেরা সেই ভাষার পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতকে ব্যবহার করে মান্য ভাষাকে এবং সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের সুরমাবরাক অঞ্চলের কিংবা ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রাকৃতকে খুবই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক শক্তিমান কবি তাঁদের কবিতায়, যা সমৃদ্ধ করেছে বাংলা কবিতাকে— দিয়েছে এক ভিন্ন স্বাদ। এই অঞ্চলের লোকসংগীত ও লোকসাহিত্যও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে কবিদের।

৭

আমাদের এই ভুবনের সাহিত্য নিয়ে কবিতা নিয়ে আমি গত চার দশকে অনেক গদ্য লিখেছি, আগেই বলেছি 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে দুটি খণ্ডে, আরেকটি খণ্ডের কাজ প্রস্তুতির পথে— সেখানে যেমন আমি এ-অঞ্চলের পত্রপত্রিকা ও কবিতা নিয়ে বিস্তারিত বলেছি তেমনই বলেছি কয়েকজন প্রধান কবিকে নিয়েও। এই ছোট্ট বক্তব্যে সেইসব আলোচনা থেকে কিছু কিছু তুলে দিয়েছি মাত্র, সুতরাং অনেক কিছুই বিস্তারিত করা গেল না— যাবেও না। এ-আলোচনা আমার আগেকার আলোচনার সারসংক্ষেপ মাত্র। তবু যাঁদের নিয়ে আলোচনা তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবীণ কয়েকজনের কবিতার কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি আশ্রয় করে এ-অঞ্চলের কবিতার সামান্য পরিচয় দিতে চাই। এই বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে।

প্রথমে বলি ত্রিপুরার কথা। কালানুক্রমিক ভাবে আমার আলোচ্য প্রধান কবিদের মুখ একটু একটু দেখি :

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মনের একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম 'জলের ভেতর বুকের ভেতর'।

"আঁধার আর মানে না ভয়, জলের ভেতর
তোমার সূর্য আলো পাখি সবই যেন
আজ হেঁয়ালি, কি বিশ্বাসে বুকের ভেতর
হাঁটবো আমি, সেখানেও একই স্বর—
ভয়ঙ্কর এক শব্দ করে ডুবলে কেউ টের পায় না
আজ হেঁয়ালি মরণ ছাড়া নেই তো কিছু
বুকের ভেতর ভালোবাসার নামান্তর।"

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী আরেক প্রবীণ কবি— তাঁরও কবিতায় এক বিষাদের ছায়া। 'ফেরা' কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দিই—

গিয়েছিল যারা অরণ্যে ফুল কুড়াতে
গিয়েছিল যারা পর্বতে জুম পোড়াতে
গিয়েছিল যারা নবতর গৃহ গড়াতে
গিয়েছিল যারা আলোকের ভোর ছড়াতে
ফিরেছে কি তারা দুলিয়ে কাশের গুচ্ছ?
ফিরেছে কি তারা ভেঙে পর্বত উচ্চ?
মন্ত্রীর বাড়ি গ্রিলের সামনে কারা এ?
ভেঙেছে কি বাঁধ মরুকঙ্কর মাড়ায়ে?

হাংরি বলে খ্যাত প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্যের কবিতা কি সত্যি হাংরি, না ষাটের দশকের প্রতিবাদী কবিকেই দেখি যে-রকম— "জ্বরের ঘোর বেড়ে না গেলে / স্বপ্ন বিকশিত হয় না। স্বপ্ন / অর্থাৎ চাওয়ার তীব্রতা— তীব্র ক্ষুধা— / জ্বর জ্বর / ভালোবাসার জ্বর / ঘৃণাতাড়িতের জ্বর / বিদ্রোহের জ্বর / পলাতকের হাজার মাইল দীর্ঘ জ্বর— / একজন তাড়িত মানুষের কোন বয়স নেই / একজন বিপ্লবীর প্রধান হাতিয়ার / তার বুকের গভীর জ্বর / একজন কবির জ্বর প্রবাহিত নদী।" ('জ্বর'— প্রদীপ চৌধুরী)

প্রতিবাদী শঙ্খপল্লব 'লিলুয়াবাজারের সমুদ্র সাঁতার' কবিতায় বলেন : "শব্দতন্ত্র আসল সত্য নয়, কিছু ফোঁস, বাকিটা জঞ্জাল / সমুদ্র সাঁতারের মুরদ নেই, ভরসা তাই কাটাখাল / সাবধানহু সামনে দাঁড়াবি না। ছিঁড়ে খাবে আলকুচি জিব / পাত্তাই দেব না অশ্রু-শব্দ স্রোত-নিশ্বাস, আলাপনী টিবটিব।"

পীযূষ রাউত ত্রিপুরার সবচেয়ে পরিচিত কবি। পীযূষের বৈশিষ্ট্য, একেবারে মুখের ভাষায় কবিতা রচনা— যেমন, "আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য / চিরকাল বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকবো / যেমন দেশের বাড়িতে / নৌকোর জন্য প্রতীক্ষমান মা ও আমি, আমি ও ছোট ভাই / নদী তীরে / ... আমি ও সান্ত্বনা, সান্ত্বনা ও সৈকত আমরা কয়েকজন / কয়েকজনের

জন্য চিরকাল, / চিরকাল প্রতীক্ষার পথ।"

স্বপন সেনগুপ্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাব্যচর্চার জগতে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। উত্তর-পূর্বের বাঙালির জীবনে এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা অন্য অঞ্চলের বাঙালির থাকার কথা নয়। কিছু বিশেষ শব্দ পর্যন্ত তাকে তাড়া করে অহর্নিশ : বিদেশী, বহিরাগত, ভূমিপুত্র — এ-সব শব্দ কবিকেও ভাবায় — উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে স্বপনের একটি কবিতার উল্লেখ আগেই করেছি। এবার অন্যরকম একটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি : "একটা বয়স আছে, যখন কোনও বিচ্ছেদই আর / বিচ্ছেদ বলে মনে হয় না / মনে হয়, নদীর ধর্মে হেঁটে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি, / এবার তো আমারই নাম ডাকার পালা।" ('একটা বয়স আছে'— দহন ও জলস্তর)

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, যিনি হাংরিদের 'স্বকাল' (১৯৬৯) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন, তাঁর কবিতায় তিনি লেখেন— "তীর্থজয় রিয়াং, কবে আর কার ধান মেপে দিবে তুমি, / রোজ রাতে অলৌকিক জুমের আগুনে / নদীর রেলিংএ এসে থেমে থাকে, / জঙ্গলের অন্ধকারে বসে থাকে বিষণ্ণ মানুষ ; / কেউ বন্দুক হাতে নিয়ে, কারো কোলে শিশু / ভীত শব্দহীন।"

এই দরদি কবিকে কি আমাদের ক্ষুধার্ত মনে হয়? হয় না তো, বরং মনের গভীরে একটু জায়গা তাঁকে ছেড়ে দিই।

প্রদীপবিকাশ রায়ের কবিতা মন্ত্রের মতো মনের গভীরে চলে যায় যখন তিনি বলেন : "অনন্ত পিপাসা নিয়ে জেগে আছে / অনেক বসন্ত রাত সম্মুখে যজ্ঞের আগুন... / তার পাশে কে ওই লোকটা পাথর-প্রতিম? / মন্ত্র মুখরতায় বিড় বিড় করে বলে যায় / অনন্তমনন দাও অনন্তমনন।" ('অনন্তমনন', নির্বাচিত কবিতা)

এবারে আমি আসি বৃহত্তর আসাম অঞ্চলের কবিতায়।

এখানে বলি, পঞ্চাশের দশকে কিংবা তারও আগে এ-অঞ্চলের যে-সব শক্তিশালী কবি কলকাতায় পাড়ি দিলেন এবং এ-অঞ্চলের কাব্যচর্চার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হল, তেমন খ্যাতিমান কবিদের কথা আমি আমার এ-আলোচনায় আনব না। স্বাধীনতার পর যথার্থ অর্থে আসাম অঞ্চলের কবি বলেই যাঁদের ক্রিয়াশীল দেখেছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যে-নাম মনে পড়ে তিনি কবি সুধীর সেন। পঞ্চাশের শুরুতেই, তখন তিনি করিমগঞ্জে, কবিতার বই 'একফালি ঘাস' প্রকাশিত হল। তাঁর একটি কবিতা পড়ি :

"চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা বুঝি নয়,
মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য নয়;
তবুও সে দাঁড়ালো এসে আলোকিত মঞ্চের ওপর
বিলম্বিত লয়ে নৃত্যপর—
ডোরা কাটা শাড়ি তার শরীরে পেঁচানো
সাপের মতন,
যেন সে পেরিয়ে এল ত্রিপুরার পাহাড়িয়া বন।"

('রিহাং নৃত্য'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

সুধীর সেনেরও আগেকার আরেক কবি দেবেন্দ্র পালচৌধুরীর কবিতায় তাঁর সৈনিক জীবনের গান শুনি :

"সৈনিক তারি নাম
শৌর্যে ধন্য অন্তর তার ভালবাসা উদ্দাম।
বলিতে কি পার মোরে
কোন দেশে তুমি যাইবে এখন কোথা থেকে কতদূরে।"

('সৈনিক'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

কবি করুণারঞ্জনের কবিতায় পাই এক গ্রামীণ পরিবেশের পরিচয় :

"ঐ ছিল গ্রামীণ পরিবেশ
লোকগীতি এস্তার চিন্তার তিল তিসি ক্ষেতে
কন্টিকারী চেয়ে আছে...
তবুও ফাল্গুনে পলাশ ফুটে গাছে।"

('তিল তিসি নক্ষত্রের ক্ষেতে'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

কবি অনুরূপা বিশ্বাস, বামপন্থী সমাজ-সচেতনতা নিয়ে যিনি পরাধীন দেশে রাজনীতিতে নেমেছিলেন ছাত্রজীবনে, তাঁর কবিতায় সেই চেতনা আমরা দেখি :

"শ্মশান চণ্ডাল হাঁক পাড়ছে থেকে থেকে
লম্বা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলছে চিতার আগুন
বিষম পরিণামের শক্ত গেরোয় ত্রিশঙ্কু জীবন
বধ্যভূমিতে পাটাতনের উপর কাঁপছে—
আমি দেব না আর কিছু দেব না
এই দেখ মুঠো বন্ধ করছি
... ...
ঘুরে দাঁড়িয়েছি ফিরে যাব বলে।"

('এমন পরবাসে'— ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

পঞ্চাশের দশকে শিলং ছেড়ে কলকাতা গিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। আর সেই দশকেই 'পরবাসী' গ্রন্থের কবি বাংলা কবিতায় নিজের একটি সম্মানের স্থান করে নেন। এক দশক পরে আবার ফিরে এলেন আসামে, সারা কর্মজীবন কাটালেন শিলঙে আর গুয়াহাটিতে। 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র কবি বাংলা কবিতার গৌরব। বীরেন্দ্রনাথ আসলে গভীরতার কবি, আপাত-দুর্বোধ্য এই কবি পাঠকের মস্তিষ্কে নয়, মনের অন্তর্ভুবনে কথা বলেন; শুনি একটুখানি :

"ক্রমশ ধোপানি আসে, একা একা কাপড় কাচতে কাচতে
আসে প্রাণে;
কোন্ প্রাণ পুষ্করিণী, যেখানে শালুকও অতি রিক্ত কুসুম।
... ...
সপ্রাণ সফেন সব নরনারী কাপড়েরই মতো শুকনো মাড়ে
খরখর করছে; নাও ইস্ত্রি করো, প্রাণ ঐ দু'তিন ভাঁজের
তেনা তেনা।"

('ক্রমশ ধোপানি আসে', ৩২ যোগিনী বসিবেক)

কত শিল্পিত হয়েছে ভাষা। ভাবুন কোন্ প্রাণ পুষ্করিণী— তবু ঐ দু'তিন ভাঁজের তেনা তেনা।

আবার দেখি এই অঞ্চলের ভাষা কীভাবে আসে তাঁর অনুভূতিতে :

"চেরাপুঞ্জি থেকে ভায়া শিলং— অবিশ্বাস্য আঁচলের খুঁটে/ পাঠাও যে মেঘ, তার পাঁচ হাজার ফুট নীচে— জল / পড়ে আছে বাংলা ভাষা / ভাষা ওঠে পর্বতারোহীর পিছে পিছে।" ('চিঠি', সাক্ষাৎকার)

এবার বহু আলোচিত কাছাড় কাব্য-আন্দোলন বা অতন্দ্র কাব্য-আন্দোলনের কবিদের কাছে আসি। আসামের সেকালের শান্ত কাব্যিক পরিবেশ হঠাৎ ক'জন তরুণের আবির্ভাবে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। 'অতন্দ্র' পত্রিকাকে মুখপত্র করে আসরে নেমেই ঢাকে কাঠি দিলেন উদয়ন ঘোষ—

"গুড় গুড় ঢ্যাং কুড় কুড় গুড় গুড় ঢ্যাং কুড় কুড়
এবার বাজাব ঢাক ছুঁড়ি তোর গায়ে সুড় সুড়
লাগে যদি আমরা নাচার।
বহমান নদীর মতন কমনীয় পাছা ও স্তন
এগুলো এমন ভীষণ লুকোবি কোথায় বা বল?
বহুদিন সয়েছি শোন
বহুদিন সয়েছি শোন
এবারে ফাটাবো কান।"

শক্তিপদ শোনালেন—

"বিষ্টি-বিষ্টি অনাচ্ছিষ্টি ভেতরে তুল্‌কালাম কাণ্ড
মেয়ে মানুষ খেয়াল গাচ্ছে লোপাট হচ্ছে মধুর ভাণ্ড
সব শেয়ালের এক রা হুজুর মধুবাতা ঋতায়তে
নাগালয়ে মা ভবানী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে।"

বিমল চৌধুরী খুব শান্ত মানুষ, তিনিও কম গেলেন না। আর বিশ্বজিৎ চৌধুরী তো সেই মুরজের আমল থেকেই খেপিয়ে বেড়ান। শান্তনু, জিতেন নাগ, অতীন দাশ পর্যন্ত কেউ কম গেলেন না। বিরোধ বেঁধেই ছিল প্রবীণদের সঙ্গে, তবু আমি যখন এলাম আমাকে তাঁরা চিহ্নিত করলেন, এবং বিশ্বজিৎকেও বিরোধিতার প্রধান কারিগর বলে। যা-ও একটু লোকদেখানো মিল ছিল তা-ও গেল ভেঙে। আসলে জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, কবিতার ভাষাভঙ্গি সব কিছুতেই এক নতুন চেহারা, গেল গেল রব পড়ে গেল কাছাড়ের কাব্যভুবনে— গর্জে উঠলেন প্রবীণ কবিরা, আরও অনেকেই। সে-সময় স্কুলশিক্ষক শক্তিপদ ও বিমল চৌধুরীকে চাকরি থেকে তাড়ানোর প্রস্তাব এল প্রকাশ্যে, আড়ালে। কিন্তু শেষ জয় হল নতুনের— অতন্দ্রের কবিদের দল বাড়তে লাগল, রুচিরা শ্যাম, উমা ভট্টাচার্যরা তো ছিলেনই, এলেন রণজিৎ দাশ আর মনোতোষ চক্রবর্তীও। তাঁরা কি কেবল খেপিয়ে বেড়ালেন পাঠকদের? না, তাঁরা এক নতুন ভাষায় আত্মকথন শুরু করলেন, আর যখন হইচই শান্ত হয়ে গেছে তখন ডুব দিলেন অন্য গভীরতায়, বিষাদে, বিদ্রুপে, ভালোবাসায়, মগ্নতায়। শুনি সেই কণ্ঠগুলি।

সাধারণ মানুষের জীবনের বুকের ভাষা, বিশ্বাস, জীবনচিত্র তাঁর কবিতায় চিহ্নিত করেন শক্তিপদ এইভাবে :

"কোথায় নিছনি কোথা চম্পক নগর
সাতনরী শিকা ঝোলে ঘরের ভিতর
কুপি লম্ফে রাতকানা নিরক্ষরা বুড়ি
লখার মরণে কান্দে আছুড়ি পিছুড়ি
জালটানা ছেলে আজ রাতে গেছে বনে
রেখো মা মানসা তার সর্বাঙ্গ কুশলে।"

('মনসামঙ্গল', অনন্ত ভাসানে)

বিমল চৌধুরী লিখলেন :

"হাট করে দোর খুলে দিলাম
শুকনো বাতাস কেবল খেলা
হাড়-কাঁপানো পাল্লা দুটোর
অবশডানা কেবল খেলা।
অঙ্গরাগেই সুবাস ছিল
ক্ষণম ইহ কেবল খেলা
পত্রমোচন তাই তো এবার
হৃদয় ভরে কেবল খেলা।"

('কেবল খেলা')

আর উদয়ন ঘোষ, ঢ্যাং কুড় কুড়ের উদয়ন ঘোষ লিখলেন—

"একেকটা দিন অন্ধকারে তোমরা আমার আহত মুখ দেখ
একেকটা দিন গভীর রেখায় আমর্মমূল অমল উন্মোচনে
... ...
সুদীর্ঘকাল মৃত গোলাপ 'ক্লান্ত জলে টুকরো চাঁদের ফালি'
সুদীর্ঘকাল একলা ঘরে সুদীর্ঘকাল রাতের ট্রেনে পাড়ি।"

('একদিন, অনেকদিন ও তোমরা'— ঝোপ জঙ্গলের কবিতা)

অন্যদেরও কবিতার একটু একটু অংশ রাখি পাঠকের কাছে। অতন্দ্র-সাহিত্য গোষ্ঠীর কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতা—

"হত্যাকারী ছুঁয়ে দেয় মধ্যরাতে
অভিমানী আলো তার রক্তময় হাতে।
প্রতিধ্বনি
শুভ্র বুকে বহে আনে সে কোন রমণী;
দীর্ঘতম সেতু
পার হলে এখন যেহেতু
হিরণ্ময় প্রেম ক্ষমার মতন আজো..."

('মধ্যযামিনীর আলো', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

রুচিরার 'ক্রান্তিক্ষণ' কবিতায় যে-বিষাদ তার ছায়া দেখি এইভাবে:

"আর এ বৃক্ষের ছায়া দীর্ঘায়িত হবে না উদ্যানে
পাথেয় গুছিয়ে নাও চর্মপাত্রে ভরে রাখো জল,
হে আমার প্রিয়তম, হে আমার নিশ্চিত নির্বেদ,
ত্রিতাপ তৃষ্ণার শান্তি পাঠ করো আনত নয়নে
সব পাতা ঝরে যায় নির্বিকার অবর্ণ সময়।"

বিশ্বজিৎ তাঁর 'শরীর দুঃখের অথবা সুখের খেলায়' কবিতায় নিজেকেই বলেন :

"শরীর সোনা তুমি এইভাবে শুয়ে থাকো পায়ের তলায়
অথবা সাদা বিছানায় চাদরে চুপচাপ
আরো অ-নে-ক দিন বেঁচে থাকতে হবে ওস্তাদ
একই জন্মে
দুঃখের অথবা সুখের খেলায়।"

শান্তনু ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বাংলা কবিতার জগতে, জয় করে এনেছিল 'কৃত্তিবাস পুরস্কার'। তাঁর 'এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে' কবিতার শেষ ক'টি পঙ্‌ক্তি—

"আমি চাই তুমি অন্যরকম হও
শাড়ির বাতাসে নিহত চঞ্চল, হাসি কুলকুচো করো
সাবানের ফেনার মত বিষাদ নাড়াও, হয়ে লুণ্ঠিত বৈভব
শুধু কণ্ঠ তুলে 'তুমি দেখ'
আর অমনি তুমি মায়ের পায়ের কাছে, কেবলই থমকানো
চোখ
এত ধৈর্য কিসের, আমায় তুমি ধৈর্য শেখাবে।"

রণজিৎ দাশ বললেন তাঁর 'প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন' কবিতায়—

"প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন— এই কথা বলে আমি
আকাশের দিকে তাকাবো না, কারণ আকাশ ভারি স্থিতিশীল
সেখানে সচরাচর গ্রহণ-দরজা আগলে বুড়ো সূর্য
পাহারায় থাকে।"

আর মনোতোষ চক্রবর্তী, অতন্দ্রের কনিষ্ঠতম কবি লিখলেন—

"তীর্থযাত্রী নই তবু এগিয়ে চলেছি পথ ভীষণ দুর্গম
চতুর্দিকে নদীর গোলকধাঁধা, চেকপোষ্ট, সে কি কিছু কম
পথে পথে দৃশ্য : নদী ও বনের কাছে এত প্রাপ্য ছিল
চূড়ায় বরফ জমা, দূরে রৌদ্র-বিচ্ছুরণে চমৎকার ছিল
বাদশার মত দেখি, এ' ভুবনে আমি একা দেখেছি সুনীল।"

('পরশুরাম কুণ্ডে', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

অতন্দ্রের কবিদের পরিচয় হল কিছু কিছু। শতাব্দীর অতীন দাশ এ-সময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি, সেকালে তিনি লিখছেন—

"আমরা জানি কি কেন এই আয়োজন
হঠাৎ হৃদয় বিহ্বল হয়ে দোলে
এত যে সন্ধ্যা কাটলো অমল স্বপ্নে
তাঁর স্মৃতি বেঁচে রবে কি হৃদয় কূলে?"

('লাগ্নিক', সাহিত্য-৩)

ওদিকে ডিব্রুগড়ে, যোরহাটে আরেক কবি ষাটের উর্ধ্বেন্দু দাশ কিছুদিন চুপচাপ থেকে সত্তরে আবার বেরিয়ে এলেন প্রকাশ্যে— বললেন :

"কি বিভোর ঘুম ঘুম গন্ধ নিয়ে জেগে এই নভোলীন
নিসর্গ, — রাত
কেমন জড়িমাহীন, দ্বিধাহীন, ক্ষিপ্রতার রুপোজরি জ্যোৎস্নার
নীল
ঝলমলে আঁচল খুলে নিভাঁজ উড়িয়ে দ্যায়
অরণ্যের বীজপত্রে, জুমশস্যে
নাহরের পুষ্পল চুড়োয়—"

('অরুণাচলে ভোর', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

শিলং শহরে রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধরেরা নতুন করে কাগজ করছেন কবিতার, কলকাতা থেকে আগত মৃণাল কিংবা শকর চক্রবর্তীদের সমান্তরালে তাঁদের কাগজ, কবিতাচর্চায় একেবারে এ-অঞ্চলের সৌরভ। রমানাথ লিখছেন—

"ভালোবাসা ডাক দিলে আমি কি দাঁড়াতে পারি স্থির পায়
যেমন দাঁড়িয়ে থাকে মধ্যরাতে ঘর
দু'হাত বাড়িয়ে দিই ছন্দময় সুখে
যেভাবে জলের গায় কিষাণ ডুবিয়ে দেয় ঘামে ভেজা
মুখ।"

('ভালোবাসা ডাক দিলে', নির্বাচিত কবিতা)

পীযূষ ধর লিখলেন—

"উমসিং নদীর জল নিংড়ে কিছু বালি
তুমি শুধু স্তূপীকৃত করে যাও। ওর
চোখ মুখ আর
ঝিলমিল ঠোঁট থেকে।"

('প্রত্যহ শিলং', নির্বাচিত সাহিত্য-১)

কিরণশংকর রায় আরেকজন কবি যিনি ত্রিপুরায় কাব্যচর্চা আরম্ভ করেছিলেন ষাটের দশকেই, কিন্তু তার পরবর্তী দশক থেকে বরাক উপত্যকায় এসে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখলেন—

"যে-কেউই ভাবে
একা হাঁটা শুধু হাঁটা নয়— সে-ও পথ, একলার পথ
হয়ত বা ভুল করে ভাবে— একা হাঁটা খুবই সংক্রামক
তবু
মানুষ ছাড়িয়ে পাথরের দিকে যায় শেষে
অথবা পাথর থেকে মানুষ ছড়ায়।"

('হাঁটাপথ', ঈশানের পুঞ্জমেঘ)

৯

বলেছিলাম তাঁদের কথা আনব না, যাঁরা একসময় এ-অঞ্চল ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে কলকাতার কবি হয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে হয় করুণাসিন্ধুর কথাটা না-বলা ঠিক নয়। পঞ্চাশের দশকে কেবল কবিতার জন্য 'স্বপ্নিল' প্রকাশ করে এ-অঞ্চলে আধুনিক কবিতার ধারা প্রথম নিয়ে এসেছিলেন— সেই করুণা ফিরলেন কাছাড়েই আবার, কিন্তু কবিতার জগৎ যেন ছেড়েই দিলেন। নব্বই-এর দশকে এসে আবার যখন আত্মপ্রকাশ করলেন বরাক উপত্যকার কাগজেই, আমরা জানলাম তিনি একটুও ফুরিয়ে যাননি, লুকিয়ে ছিলেন মাত্র এবং তাঁর মনে হল—

"নীরব কবির কোন ভাষা নেই, আশা নেই মূঢ়;
মনে মনে কল্পনায় রাজহাঁস খেলা করে যায়
অদৃশ্য আলোকে,— তাতে এমন কি বিস্ময় নিগূঢ়
শ্যামের তুড়িতে বাজে রাধার তেহাই চেতনায়।"

(সাহিত্য-৫৩)

বাংলা কাব্যে অসাধারণ সব সনেটের জন্য করুণাসিন্ধু দে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৬৭-তে 'আসামে আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে, এর পরে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'-র ভূমিকায় লিখেছিলাম, "আজকে কাছাড়ের কবিতাই আসামের বাংলা কবিতা"— তারপর অনেক কাল চলে গেছে, বৃহত্তর আসামের দিকে দিকে অনেক শক্তিমান কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের কথা আমি যথাসাধ্য বলেছি— তবু আজও বলি, গত শতাব্দীতে আসামে বাংলা কবিতায় এবং আজ পর্যন্তও বরাক উপত্যকার অবদান সর্বাধিক। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য যেমন বরাক উপত্যকার মানুষই কেবল বারবার সংগ্রাম করেছেন, শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক অবদান রেখেছেন এই

উপত্যকারই কবিরা। আমার আলোচনা দীর্ঘ হচ্ছে জানি, তবু শোনাই তাঁদের কয়েকজনের কণ্ঠস্বর, সত্তরের দশক থেকে একেবারে দু'হাজার পর্যন্ত যাঁরা মাতিয়ে রাখলেন এ-অঞ্চলের বাংলা কবিতাকে, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন বৃহত্তর বাংলা কবিতার অঙ্গনে।

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য :

"এই মাঠ, বেনোজলে হাঁসফাঁস ধানের ক্ষেতের মাঠ
চোখের জলের স্মৃতি ধুয়ে ফেলে স্রোতের আবেগে—
আঁকড়ে ধরেছে দেখো পলির আশ্বাস
তার স্বপ্ন।"

('এই মাঠ শ্রাবণের', অনন্ত নীরব)

তপোধীর ভট্টাচার্য :

"আগুনের কাছে এত দ্রুত যাবে?
যাও, তার জলের করুণা
শিখে নিয়ো।
লাজুক সন্ধ্যার চোখে নিমীলিত
অশ্রু ফুটেছিল, তাকে
ভুলে যেয়ো।"

('যাও', নির্বাচিত সাহিত্য-১)

দীপঙ্কর নাথ :

"কোনদিন জলপ্রপাতের মতো প্রেম
আসে, অই কিশোরীর— তোমাদের প্রত্যেকের
বুকে সেই প্রসারিত শব্দ হয়, আমিও অধীর
হয়েছি প্রেমে তার।"

('কোন দিন', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

দিলীপকান্তি লস্কর :

"এদের জন্য দু'চোখ ঝরে? ঝরুক বুক চেপে সহ্য কর
একটু হলেই শুনে ফেলবে
খট্ খট্ খট্ কার্ফু মাটি থর্ থর্ থর্।
যীশুর ঘিলু ছিন্নভিন্ন, জগন রক্ত ধড়
এই বিপদে মাতৃভাষায় কান্না বন্ধ কর।"

('৮৬-এর ২২ জুলাই রাতে, সুমনাকে', সাহিত্য-১৯)

ভক্ত সিং :

"মায়াবী হলুদ বড় কাছে টানে
পাহাড় লাইন বেয়ে ঝিক ঝিক মহুয়ার ট্রেন
সুখে আছি এই বলে
রুমাল উড়িয়ে যাওয়া ধবধবে নারী ও পুরুষ

... ...

চলো মাটিতে বর্শার মতো গেঁথে দিই
মানুষের উজ্জ্বল আকাশ।"

('মাটিতে বর্শার মতো', সাহিত্য নবপর্যায়-১)

দেবাশিস তরফদার :

"শরৎ। আনন্দে বাড়ি-ফেরা।
সাজিয়েছ ঘাসের ডালি অনেকদূর।
বসিয়েছ লালবাড়ি লাল কাঁকরের পথ
ফিরিয়ে এনেছ নীলাকাশ।

... ...

রিক্তঘরে দুখীঘরে তার বরণ
আনন্দের গৃহে আগমন।"

('আগস্ট ৯৫', সাহিত্য-৫৬)

শঙ্করজ্যোতি দেব :

"আশার দহন আর বোধের কামড়ে
গড়ে ওঠে দাক্ষিণ্যের ঘর, হে পূর্ণতা
সফল মেঘের মতো ভোর হয়ে এসো
ভোর হয়ে এসো ফিরে ফসলের ঘরে।"

('নবান্ন', সাহিত্য নবপর্যায়-৩)

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য :

"একটা জীবন ঝরে পড়লো
সামান্য সে ক্ষতি
যুথচিতায় পুড়লো শবদেহ
সারারাত্তির ছড়ায় আলো
হিরণ্য মোমবাতি
সারারাত্তির একই দাবদাহ।"

('একটা জীবন', এই আলো হাওয়া রৌদ্রে)

অমিতাভ দেব চৌধুরী :

"ভোরের ময়লা ফেলা গাড়ি এই শহরের
প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখে সুগন্ধ, ফুলের।
বুকে বহে নিয়ে যায় সভ্যতার পুঁজ,
গলিত আঁধার লিপি মালা হররোজ

... ...

এ কথা জানে না গাড়ি, স্বপ্নে ফুল ঝরে
দিনের ধুলায় তার ইতিহাস ওড়ে।"

('ফুল কাহিনী', সাহিত্য-৭৭)

স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য :

"প্রথমে ফেরাও মুখ
আড়চোখে আবার তাকাও
ভ্রূভঙ্গে চাঁদের মতো
উঁকি দেয় তৃতীয় নয়ন।"

('দেবী', সাহিত্য-৪৩)

সুব্রতকুমার রায় :

"এখান থেকে গ্রাম খুব দূরে নয়
মাঝে মাঝে যাই শহরতলী, কাঠের সাঁকো পেরিয়ে
মেঠোপথ হেঁটে, নদীর পাশে বসে বসে দেখি
দিগন্তে আদিগন্ত মিশে যেতে
ভাবি গ্রাম তার কাছাকাছি খুব।"

('আঁধার গ্রাম', সাহিত্য-৭৮)

এইভাবে অনেকের কবিতার কিছু উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি মনে আসে। যাঁদের কথা বলি, থেকে যায় আরও বেশি জনের কথা। আসলে সীমিত পরিসরে একজন কবিকে নিয়ে বলা সহজ, তাঁর কবিতার বিশেষ দিক নিয়ে বলা আরও সহজ, কিন্তু যখন দশজনকে নিয়ে বলতে হয় তখনই সময় ভাগ করতে হয়, আর এ-সংখ্যা যদি একশো হয় একসঙ্গে তাহলে তাঁদের বিচার করতে গেলে অবিচারই হয় কেবল। এখানেও হয়তো অনেকের প্রতি অবিচারের প্রশ্ন উঠবে। তবু এই হয়, এই হবে— আমার বলায় হবে, সকলের বলাতেই হবে। হবে না কেবল সেই কবিদের ক্ষেত্রে যাঁরা অনেককে ছাপিয়ে যান স্বাভাবিক প্রতিভায়। আমরা, কবিতাপাঠকরা তেমন মুখ অনেক দেখি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতায়। এবং তাঁদের বিকাশের পথ চেয়ে থাকি।

পরিশেষে একটা কথা বলি। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং চর্চার যে-অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি তাতে নিশ্চিত করে বলতে পারি, বাংলা কবিতায় এই তৃতীয় ভুবন অচিরকালের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভুবনের অধিকার অর্জন করবে— বাংলা কাব্যকে করবে আরও গৌরবান্বিত। ❑

তথ্যসূত্র :

১ ('উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, সমস্যা ও সম্ভাবনা') উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য ১ম খণ্ড, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১১-১২, সাহিত্য প্রকাশনী

২ ওই, পৃ. ১৬

৩ রবি চক্রবর্তী ও কলিম খানের লেখা 'বাংলা ভাষা প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পৃ. ২৪১, ভাষাবিন্যাস ২০০৬

৪ 'ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখা', ধবলকৃষ্ণ দেব বর্মন। ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, প্রকাশক ত্রিপুরা সরকার

৫ 'কবিতার ইস্‌কুল মাস্টারি, আউলা ঝাউলা', বিমল চৌধুরী, পৃ. ৬৯, সাহিত্য প্রকাশনী

৬ 'ত্রিপুরার সাম্প্রতিক সাহিত্য', স্বপন সেনগুপ্ত, সাহিত্য-৮৪

৭ 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য ২য় খণ্ড', বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৮৪, সাহিত্য প্রকাশনী